গণদাবী
সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার
বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)
প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর
৫ আগস্ট, ২০০৪ মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ সংখ্যা

সূচিপত্র

- **কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রদ্ধার্ঘ**
- **কমরেড শিবদাস ঘোষের ভাষণ**
  ২৪ এপ্রিল ১৯৭০
- **দলের নেতৃস্থানীয় সংগঠক ও কর্মীদের প্রতি**
  নীহার মুখার্জী

কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রদ্ধার্ঘ

(আমাদের দল সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইণ্ডিয়ার প্রিয় নেতা, শিক্ষক, পথপ্রদর্শক ও সাধারণ সম্পাদক **কমরেড শিবদাস ঘোষ** গত ৫ আগস্ট, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা ৭-৩০ টায় কলকাতায় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিউনে গুরুতর হৃদরোগে (মায়োকারডিয়াল ইনফাকশন) আকস্মিক আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বৎসর।

তাঁর আকস্মিক ও অকাল মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দলের কেন্দ্রীয় কমিটি মহান প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ জানিয়ে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করে।)

আমাদের প্রিয় নেতা, শিক্ষক, পথপ্রদর্শক ও আমাদের দল সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া'র সাধারণ সম্পাদক **কমরেড শিবদাস ঘোষের** আকস্মিক ও অকাল মৃত্যুতে কেন্দ্রীয় কমিটি গভীর শোক প্রকাশ করছে। **কমরেড শিবদাস ঘোষ** ছিলেন এ যুগের অন্যতম অগ্রণী মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক। তিনি ভারতের মাটিতে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে বিশেষীকৃত করেন এবং লেনিন নির্ধারিত 'সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবে'র যুগের বর্তমান স্তরে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের বহু বিষয়কে বিকশিত, সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করেন এবং অন্য বহু বিষয়কে এক নতুন ও উন্নত স্তরে পৌঁছে দেন। শুধুমাত্র রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, এমনকি জীবন ও জ্ঞানজগতের সর্বস্তরকে ব্যাপ্ত করে, যথা বিজ্ঞান ও দর্শন, নীতি-নৈতিকতা, সংস্কৃতি ও শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতি সর্ববিষয়ে লেনিন পরবর্তী সময়ে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেই সমস্ত সমস্যাগুলোকে ব্যাখ্যা ও সমাধান করতে গিয়ে তিনি মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের এক নতুন ও সুনির্দিষ্ট বিশেষ উপলব্ধি গড়ে তোলেন। ফলে, আমাদের সকলের কর্তব্য হবে **কমরেড শিবদাস ঘোষের** চিন্তাধারার গভীর অনুশীলন করা, যা নাহলে বর্তমান যুগের এই স্তরে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কিত ধারণা সম্পূর্ণ হতে পারে না।

একটি সঠিক সর্বহারা বিপ্লবী দলের অনুপস্থিতিজনিত পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের বিপ্লবের প্রয়োজনকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করে তিনি এদেশের মাটিতে একটি সঠিক সাম্যবাদী দল গড়ে তোলার ঐতিহাসিক দায়িত্বভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, যার সাথে সর্বপ্রকার শোষণ-নিপীড়নের হাত থেকে জনতার মুক্তির প্রশ্নটি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। **কমরেড শিবদাস ঘোষ** এই দল গঠনের প্রক্রিয়াতেই কোটি কোটি শোষিত মানুষের মহান নেতা হিসাবে ঐতিহাসিকভাবে আবির্ভূত হলেন। আমাদের দেশে একটি সত্যিকারের সাম্যবাদী দল গড়ে তোলার এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে **কমরেড শিবদাস ঘোষ** মার্ক্সবাদী পার্টি গঠনের লেনিনীয় তত্ত্বটিকে আরও সমৃদ্ধিশালী এবং এক নতুন ও উন্নত স্তরে পৌঁছে দেন ও দেখান যে, জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার পথে আদর্শগত কেন্দ্রিকতা গড়ে উঠলেই কেবলমাত্র সাংগঠনিক কেন্দ্রিকতা গড়ে তোলা সম্ভব এবং একমাত্র এই পর্যায়েই পার্টিটি organic whole-এ পরিণত হয়। তাঁর মধ্যেই দলের যৌথ নেতৃত্বের ব্যক্তিকৃত ও বিশেষীকৃত রূপটি মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনে আদর্শগত ক্ষেত্রে **কমরেড শিবদাস ঘোষের** অসামান্য অবদান তাঁকে এক বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতারূপে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। আধুনিক সংশোধনবাদ ও সংস্কারবাদই যে বর্তমান বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের সামনে প্রধান বিপদ — এটা তিনিই প্রথম দেখান এবং এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঠিক পথও তিনিই নির্দেশ করেন। বুর্জোয়া দর্শনের বিভিন্ন ধারা, বিশেষ করে তার আধুনিকতম রূপগুলি যে সমস্ত বিভ্রান্তি

সৃষ্টি করে চলেছে, তার বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রামে তাঁর যুগান্তকারী অবদান শুধু আমাদের দেশের বিপ্লবী আন্দোলনেই নয়, বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনেও পথ দেখাবে।

অর্থনীতিবাদ, সুবিধাবাদ এবং সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির বিভিন্ন ধারা, যা আমাদের দেশের শ্রমিক আন্দোলনের গভীরে অনুপ্রবেশ করেছে, তার বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিক আন্দোলনকে তিনি এক নতুন ও সঠিক খাতে প্রবাহিত করেন। অগণিত শোষিত মানুষের সামনে তিনি এই শিক্ষাই তুলে ধরেন যে, সর্বহারাশ্রেণীর সঠিক মূল রাজনৈতিক লাইনের প্রতি সর্বদা অবিচল থেকে জনতার নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিতে না পারলে শোষিত জনগণের বাঞ্ছিত মুক্তি অর্জন কখনই সম্ভব নয়। কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের মহত্বকে তিনি প্রতিমুহূর্তেই ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন এবং দেখিয়েছেন, যে কোন উচ্চ আদর্শের মর্মবস্তু নিহিত থাকে তার উন্নত নীতি-নৈতিকতা ও রুচি-সংস্কৃতিগত মানের মধ্যে। সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী রাজনীতির চর্চা এবং বিকাশের সংগ্রামটি কমিউনিস্ট নীতি-নৈতিকতার উন্নত আধারের ওপর গড়ে তুলতে তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। কোন বিপদেই ভীত না হতে, বরং সমস্ত বিরুদ্ধ পরিস্থিতি ও শক্তিকে বিপ্লবী তেজ ও দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করার মধ্য দিয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতিকে অনুকূল পরিস্থিতিতে রূপান্তরিত করার শিক্ষাও তিনি আমাদের দিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় কমিটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিটি প্রশ্নে তাঁর সঠিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বহু যুগ ধরে সর্বহারাশ্রেণীর মুক্তি আন্দোলনে অমূল্য পথনির্দেশ হিসাবে কাজ করবে। কেন্দ্রীয় কমিটির সুদৃঢ় অভিমত এই যে, জ্ঞানতত্ত্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর বহু অবদান মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের জ্ঞানভাণ্ডারে নিশ্চিতরূপে নতুন সংযোজন। কেন্দ্রীয় কমিটি এ বিষয়ে সুনিশ্চিত যে, আমাদের প্রিয় নেতা **কমরেড শিবদাস ঘোষের** — দল, শ্রেণী ও বিপ্লবের সাথে নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে দেওয়ার (identification) অনন্যসাধারণ বিপ্লবী চরিত্রের মহান দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করে দলের সমস্ত নেতা, কর্মী, সমর্থক ও দরদী বিপ্লবী সংগ্রামে নিজেদের আরও বেশি করে নিয়োজিত করবেন এবং মহান নেতা শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক **কমরেড শিবদাস ঘোষের** নিজের হাতে গড়া পার্টিটির সাথে উত্তরোত্তর নিজেদের বিলীন করার সংগ্রামে এগিয়ে আসবেন।

এই বিরাট ক্ষতির মুহূর্তে তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমরা আমাদের হৃদয়ের গভীর বেদনাকে সুদৃঢ় সংকল্প, সাহস এবং বিপ্লবী উদ্দেশ্যমুখীনতায় রূপান্তরিত করার শপথ গ্রহণ করছি। আমরা অঙ্গীকার করছি, 'এক মানুষ'-এর (one man) মত দাঁড়িয়ে তাঁর অভাব পূরণের কঠোর সংগ্রামে আমরা ব্রতী হব। তাঁর শিক্ষা এবং চিন্তার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন এবং নিরন্তর থাকবেন। যে আরব্ধ কাজ সমাধা করার নির্দেশ তিনি রেখে গেছেন, সেই মহান দায়িত্ব পালন করতে যে অগণিত বিপ্লবীরা এগিয়ে আসবেন তাদের কাছে **কমরেড শিবদাস ঘোষ** এই নাম এবং তাঁর শিক্ষা প্রোজ্জ্বল আলোকবর্তিকা ও জীবন্ত প্রেরণার উৎস হিসাবে নিয়ত বিরাজ করবে। আসুন কমরেড, আমরা তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত অসংখ্য বিপ্লবী কর্মী ও অনুরাগী প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে বিপ্লব এবং সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের মহান পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরি।

প্রয়াত মহান নেতা, আমাদের শিক্ষক এবং পথপ্রদর্শক **কমরেড শিবদাস ঘোষের** প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় কেন্দ্রীয় কমিটি রক্তপতাকা অর্ধনমিত করছে এবং তাঁকে লাল সেলাম জানাচ্ছে।

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেণ্টার অফ ইণ্ডিয়া
কেন্দ্রীয় কমিটি

৬ আগস্ট, ১৯৭৬
৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩

কমরেড শিবদাস ঘোষের ভাষণ
২৪শে এপ্রিল ১৯৭০

মুখবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গের ১৯৬৯ সালের দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন তথা বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এক সঙ্কটজনক মুহূর্তে ১৯৭০ সালের ২৪ এপ্রিল মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ এই মূল্যবান ভাষণ দেন। সেই সময়ের ঝঞ্ঝাবহুল রাজনৈতিক অধ্যায় নবীন প্রজন্মের সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং প্রবীণরা অনেকেই বিস্মৃত হয়েছেন। সেইজন্য অতি সংক্ষেপে তৎকালীন পরিস্থিতির কিছু প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলী উল্লেখ করা প্রয়োজন।

'৪৭ সাল থেকে '৬৬ সাল পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন কংগ্রেস শাসন চললেও অবিভক্ত বাংলার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আপসহীন বামপন্থী আন্দোলনের ঐতিহ্য বহন করে পশ্চিমবঙ্গে একের পর এক শক্তিশালী গণআন্দোলনের ঢেউ কংগ্রেস শাসনের ভিতকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। এগুলির মধ্যে '৫২ সালের খাদ্য আন্দোলন, '৫৩ সালের এক পয়সা ট্রামভাড়াবৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন, '৫৪ সালের শিক্ষক আন্দোলন, '৫৫ সালের গোয়ামুক্তি আন্দোলন, '৫৬ সালের বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলন, '৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলন, '৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই আন্দোলনগুলির ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও বামপন্থার প্রতি গভীর আবেগ ও আস্থা সৃষ্টি হয়। '৫২ সাল থেকে একের পর এক যে আন্দোলন চলছিল, তাতে বারবার আইন অমান্য, অবরোধ, রাস্তায় পুলিশের সাথে ব্যারিকেড ফাইট, সাধারণ ধর্মঘট (যা এখন বন্‌ধ বলে পরিচিত) সংগঠিত হয়েছে। '৫৯ সালে এসব ছাড়াও কলকাতায় থানা অবরোধ শুরু হয়, '৬৬ সালে এই থানা অবরোধ সমগ্র রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে, ব্যাপক পুলিশি আক্রমণ হয়, বহু মানুষ শহীদ হন, সমগ্র রাজ্যে কংগ্রেস বিরোধী মানসিকতা তীব্র রূপ ধারণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে '৬৭ সালে বিধানসভার নির্বাচন হয়। নির্বাচনে সাধারণ মানুষের মধ্যে কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করে বামপন্থীদের নির্বাচিত করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়, কংগ্রেসে ভাঙন হয় এবং কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে অজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে বাংলা কংগ্রেস গঠিত হয়।

সেই সময়ে বাংলা কংগ্রেস, প্রাক্তন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষের পি ডি এফ ইত্যাদি আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলকে নিয়ে সি পি এম-সি পি আই নির্বাচনে কংগ্রেস বিরোধী মোর্চা গঠনে উদ্যোগী হলে এস ইউ সি আই এতে আপত্তি জানিয়ে শুধুমাত্র বামপন্থীদের নিয়ে ফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব দেয় যেটা অন্যেরা মানতে অসম্মত হয়। অবশ্য পরে সিট ভাগাভাগি নিয়ে সি পি এম ও সি পি আই-এর তীব্র কোন্দলের ফলে নির্বাচনে আলাদা দুটি মোর্চা গড়ে ওঠে এবং কংগ্রেসবিরোধী ভোট ভাগ হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, জনগণের প্রবল কংগ্রেস বিরোধিতার ফলে ভোটের ফলাফলে দুই মোর্চা মিলে মেজরিটি হয়ে দাঁড়ায় এবং নির্বাচনের পর দুটি জোট মিলে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে। এই যুক্তফ্রন্ট সরকারে এস ইউ সি আই-এর আপত্তি সত্ত্বেও মূলতঃ সিপিএম-সিপিআই-এর চাপে বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখার্জীকে মুখ্যমন্ত্রী করা হয়। এস ইউ সি আই-কে যখন সরকারে যোগদান করতে আহ্বান করা হয়, তখন দলের পক্ষ থেকে বলা হয়, একটি মার্কসবাদী দল হিসাবে এস ইউ সি আই, বুর্জোয়া রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে সরকারে যেতে পারে যদি গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রাম

বিকাশের স্বার্থে, বাজেটে পুলিশ ও আমলাদের পেছনে অত্যধিক ব্যয় না করে শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও গরিব মানুষকে রিলিফ দেওয়ার প্রয়োজনে অধিকাংশ ব্যয় করা হয় এবং পুলিশবিভাগ ও প্রশাসনকে দলীয় কর্তৃত্ব ও দুর্নীতিমুক্ত করা হয়। এস ইউ সি আই-এর তরফ থেকে দাবি করা হয়, সরকারকে ঘোষণা করতে হবে যে, ন্যায়সঙ্গত গণআন্দোলনগুলোকে পুলিশী হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। বাকিগুলি মেনে নিলেও সি পি এম, বাংলা কংগ্রেস, সি পি আই ও অন্যেরা 'আইন শৃঙ্খলা রক্ষার' দোহাই দিয়ে এস ইউ সি আই'র এই দাবি মানতে কিছুতেই সম্মত হচ্ছিল না। তখন এস ইউ সি আই জানায় যে, এটা না মানলে দল মন্ত্রীসভায় যোগ দেবে না, কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন জানাবে। ঐ সময়ে পশ্চিমবঙ্গে জনগণের মধ্যে বামপন্থা ও গণআন্দোলনের মানসিকতা খুবই প্রবল ছিল, বিপ্লবের জঙ্গি স্লোগান তুলে সদ্য সি পি আই থেকে সি পি এম বেরিয়ে এসেছিল এবং কর্মী-সমর্থকদের এক বিরাট অংশের মধ্যে (যারা অনেকেই পরে নকশাল লাইনে চলে গেল) বিপ্লব, শ্রেণীসংগ্রাম ইত্যাদি সম্পর্কে যথেষ্ট আবেগ ছিল। এ অবস্থায় এস ইউ সি আই-এর সাথে এই প্রশ্নে মতপার্থক্য প্রকাশ্যে চলে এলে বেকায়দায় পড়ার সম্ভাবনা আছে দেখে সি পি এম নেতৃত্ব বাধ্য হয়ে শেষপর্যন্ত কাগজে-কলমে আমাদের শর্তগুলি মেনে নেন। বুর্জোয়া পার্লামেন্টে নির্বাচিত সাংসদ হিসাবে বিরোধী ভূমিকা পালন করতে গিয়ে কমিউনিস্টরা কীভাবে শ্রমিকশ্রেণী, গরিব কৃষক ও শোষিত জনগণের সামনে বুর্জোয়া পার্লামেন্টের শ্রেণীচরিত্র উদ্‌ঘাটন করে বাইরের শ্রেণীসংগ্রাম ও গণআন্দোলনকে কীভাবে কমিউনিস্টরা শক্তিশালী করে, এটা বহু পূর্বেই লেনিন দেখিয়েছিলেন। আবার এককভাবে বা যুক্তমোর্চার মাধ্যমে কমিউনিস্টরা যদি কোথাও সরকার গঠনের সুযোগ পায়, তাহলে সেই সুযোগকে কীভাবে বুর্জোয়া রাষ্ট্র ও পার্লামেন্টের শ্রেণীচরিত্র উদ্‌ঘাটন করা ও বাইরের শ্রেণীসংগ্রাম ও গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারে, কমরেড শিবদাস ঘোষ তা দেখান এবং লেনিনের এই সংক্রান্ত তত্ত্বকে আরও সমৃদ্ধ ও বিকশিত করেন।

সরকারে গিয়ে এস ইউ সি আই নেতা কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী শ্রমমন্ত্রী হিসাবে এই নীতিকে সার্থকভাবে রূপায়ণের জন্য উদ্যোগী হন। মন্ত্রীত্বে বসার সাথে সাথে তিনি তাঁর দপ্তর থেকে 'ন্যায়সঙ্গত শ্রমিক আন্দোলনে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না' এই নীতিটি ঘোষণা করেন। এই নীতির ফলে পশ্চিমবঙ্গে প্রবল শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হয়। স্লোগান ওঠে, 'যুক্তফ্রন্ট সরকার গণআন্দোলনের হাতিয়ার'। এর প্রভাব ভারতবর্ষের অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আতঙ্কিত হয়ে উঠে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা, তাদের চাপে সরকারের মধ্যে সি পি এম, বাংলা কংগ্রেস প্রভৃতি দল 'গণআন্দোলনে পুলিশী নিপীড়ন হবে না', যুক্তফ্রন্ট সরকারের এই ঘোষিত নীতি প্রয়োগে নানাভাবে বাধা দিতে থাকে, শ্রমদপ্তর থেকে এস ইউ সি আই-কে সরিয়ে দেবার ষড়যন্ত্রও করে। সরকার পরিচালনায় এস ইউ সি আই-এর বৈপ্লবিক লাইন ও সি পি এম এবং অন্যদের সংস্কারবাদী লাইনের সুস্পষ্ট পার্থক্য প্রকাশিত হতে থাকে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে এবং শেষপর্যন্ত রাজ্যপালকে দিয়ে ৯ মাস বাদে '৬৭ সালের প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটায়। কেন্দ্রের এই অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষ ধিক্কার জানায় এবং প্রায় বর্ষব্যাপী রাজ্যের সর্বত্র ব্যাপক বিক্ষোভ আন্দোলন চলতে থাকে, সারা দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ পশ্চিমবঙ্গের জনগণের এই সংগ্রামের পাশে দাঁড়ায়। এরপর '৬৯ সালে যখন বিধানসভার ভোট হয় তখন কংগ্রেস জনমতের জোয়ারে পুরোপুরি ভেসে যায় এবং যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের সময় সি পি এম-বাংলা কংগ্রেস ও অন্যেরা দেশি-বিদেশি পুঁজির ইচ্ছা অনুযায়ী পূর্বতন যুক্তফ্রন্ট সরকারের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় মন্ত্রী এস ইউ সি আই নেতা সুবোধ ব্যানার্জীকে সরিয়ে সি পি এম-কে শ্রমমন্ত্রীত্ব দেয়, যাতে গণআন্দোলন সম্পর্কে পূর্বেকার ঘোষিত নীতিকে অকার্যকরী করা যায়। এতদ্‌সত্ত্বেও এস ইউ সি আই সরকারে থেকে এই নীতির বিচ্যুতি প্রতিরোধ করতে থাকে এবং এই প্রশ্নে এস ইউ সি আই-এর সাথে সি পি এম-বাংলা কংগ্রেস সহ অন্যদের তীব্র মতবাদিক সংগ্রাম চলতে থাকে।

অন্যদিকে আদর্শগত সংগ্রামের পরিবর্তে গায়ের জোরে ও কুৎসা রটিয়ে দলবল বাড়াবার যে নীতি নিয়ে সি পি এম চলছিল, '৬৭ সালে ক্ষমতার অপব্যবহার করে তারা তার ব্যাপক প্রয়োগ করেছিল। '৬৯ সালে পুলিশ দপ্তরের মন্ত্রীত্ব নিজেদের হাতে নিয়ে সি পি এম এই একই সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে শুধু কংগ্রেস নয়, যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত এস ইউ সি আই, সি পি আই, বাংলা কংগ্রেস, আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক — সব দলের কর্মী ও সমর্থকদের উপর ব্যাপক আক্রমণ চালায়। অনেকেই নিহত ও আহত হন এবং এটাকেই সি পি এম 'শ্রেণীসংগ্রাম' বলে আখ্যা দেয়। ফ্রন্টের ঐক্য ব্যাহত হতে থাকে, জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় এবং কংগ্রেস এর সুযোগ নিতে থাকে। ইতিপূর্বে সি পি এম নেতৃত্বের সংশোধনবাদী নীতিতে ক্ষিপ্ত দলের সর্বাপেক্ষা সৎ ও জঙ্গি যে অংশ পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসাবে উগ্র বামপন্থী নকশাল লাইনের দিকে চলে গিয়েছিল তাদের উপরও সি পি এম নেতৃত্ব হিংস্র আক্রমণ চালায়। এই সময় পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র খুন-জখম-সন্ত্রাস সৃষ্টি করে যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত দলগুলিকেও নিশ্চিহ্ন করে সি পি এম একক বা অস্তিত্বহীন সাইনবোর্ড সর্বস্ব কিছু দলকে নিয়ে সরকার গঠনের ষড়যন্ত্র করে। ঐ সময় তাদের এই আচরণের সমর্থনে তারা এক অভিনব তত্ত্বও হাজির করে। সেটা হচ্ছে যুক্তফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গিয়েছে এবং 'শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্ট' গঠনের সময় এসে গিয়েছে।

এই হীন উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙার জন্য সি পি এম নেতৃত্ব পরিকল্পিতভাবে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জীর উপর রাইটার্স বিল্ডিংয়ে হামলা চালায় যাতে তিনি পদত্যাগ করে সরকার ত্যাগ করেন। অজয় মুখার্জী এমনিতেই সি পি এম-এর হামলায় আক্রান্ত মানুষদের কাতর আবেদনের কোন প্রতিকার করতে না পেরে অসন্তুষ্ট ও হতাশাগ্রস্ত ছিলেন এবং নিজেকে অসহায় বোধ করছিলেন। তারপর এই হামলায় সি পি এমের ষড়যন্ত্র বুঝতে না পেরে তিনি পদত্যাগ করেন। সি পি এম মনেপ্রাণে চাইছিল সরকার ভাঙুক, কিন্তু ভাঙার দায়িত্ব যাতে অন্যের ঘাড়ে চাপানো যায়। এই অবস্থায় এক অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় এবং জনমানসে এমন বিভ্রান্তিও সৃষ্টি হয় যে বিভিন্ন দলের পার্থক্য থাকায় যুক্তফ্রন্ট সরকার চলা সম্ভব নয়। এই সময় এস ইউ সি আই দলের পক্ষ থেকে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিসম্মত এক আচরণবিধি প্রণয়ন করে দেখানো হয় যে, এই আচরণবিধি অনুসরণ করেই যুক্তফ্রন্টের ঐক্য রক্ষা করা সম্ভব। অন্য দলগুলি এই আচরণবিধি মানতে সম্মত হলেও সি পি এম রাজি হয়নি, কারণ তারা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে টিকিয়ে রাখতে চাইছিল না। তারা প্রচার করতে থাকে যে, বাংলা কংগ্রেস জোতদারের দল, তাদের সাথে সরকার করা যায় না (অথচ এস ইউ সি আই-এর আপত্তি সত্ত্বেও তারা '৬৭ সালে বাংলা কংগ্রেসকে যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত করেছিল)। সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক ও অন্যেরাও সি পি এমের এই আগ্রাসী নীতির জন্য তার সাথে থাকতে চাইল না। সেই সময় সি পি আই ও ফরওয়ার্ড ব্লক এতদূর সি পি এম বিরোধী হয়ে গিয়েছিল যে তারা '৭২ সালে কংগ্রেসের সাথে সরকার গঠনে গেল, যদিও তারা '৭১ সালেই যাওয়ার মুখে ছিল, এস ইউ সি আই ফ্রন্ট করে তাদের বেঁধে রেখেছিল।

পশ্চিমবঙ্গের জনগণ খুব আশা নিয়ে '৬৭ সালে ও '৬৯ সালে যুক্তফ্রন্টকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। ফলে '৬৯ সালে এত বিপুল ভোটে জয়ী হলেও সি পি এম-এর প্রবল খুনোখুনি ও সন্ত্রাসের রাস্তায় শরিক দলগুলিকে নিশ্চিহ্ন করার রাজনীতির পরিণামে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে যাওয়ায় জনমনে প্রবল হতাশা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় এবং পরপর দুইবার ভোটে পরাস্ত কংগ্রেস এর সুযোগ নিতে থাকে। মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ তৎকালীন সময়ে সিপিএমের খুনোখুনির রাজনীতির রাস্তায় অপর দলের সংগঠন ভাঙা ও 'শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্ট' গঠনের স্লোগানের চূড়ান্ত অমার্কসবাদী ও সুবিধাবাদী চরিত্র, যার ফলে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যায়, উদ্‌ঘাটন করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বর্তমান স্তরে যুক্তফ্রন্টকে পুনরুজ্জীবিত করার আহ্বান জানিয়ে এই মূল্যবান ভাষণটি দিয়েছিলেন। এই আলোচনা সি পি এম দলের গদিসর্বস্ব সংশোধনবাদী চরিত্র ও যুক্ত আন্দোলনবিরোধী সুবিধাবাদী ভূমিকা বুঝতে খুবই সাহায্য করবে। সাথে সাথে যুক্ত আন্দোলন ও যুক্তফ্রন্ট পরিচালনায় সঠিক মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্তর থেকে বিপ্লবী সংগ্রামের স্তরে উত্তরণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি গড়ে তুলতেও এই আলোচনা সাহায্য করবে।

কমরেড শিবদাস ঘোষের ভাষণ

কমরেড সভাপতি, উপস্থিত বন্ধুগণ এবং কমরেডস্,

আজকের এই বৃহৎ জনসমাবেশে, যদিও আমার কাছে ইতিমধ্যেই নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার অনেক অনুরোধ এসেছে, তবুও আমি মনে করি, এই একটি সমাবেশেই সমস্তরকমের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নগুলির যথাযথ আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নটি বর্তমানে পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন প্রতিটি মানুষের মনকে আলোড়িত করছে, সেই প্রশ্নটি নিয়েই মূলত আমি আলোচনা করব।

বিশ বছরের একটানা কংগ্রেসি রাজত্বের জুলুম, অত্যাচার এবং শোষণের বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবাংলার জনমত কংগ্রেসকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দু'দুবার (১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সাল) যুক্তফ্রন্ট সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বিশেষ করে এবার (১৯৬৯ সাল) এতো বিপুল সংখ্যায় তাদের জিতিয়ে ক্ষমতায় বসিয়েছিল, যা আগে কখনও ভাবা যায়নি। অথচ সেই যুক্তফ্রন্ট এবং যুক্তফ্রন্ট সরকার শেষপর্যন্ত টিকে থাকতে পারল না, ভেঙে গেল। কেন? এ প্রশ্নে যা হয় একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া চলে না, চলতে পারে না। এ দায়িত্ব যুক্তফ্রন্টের সমস্ত রাজনৈতিক দলের। বৃহৎ বামপন্থী রাজনৈতিক দল বলে যাঁরা নিজেদের ঘোষণা করেন, কৈফিয়ৎ দেবার এবং সমস্ত অবস্থাটা খুলে বোঝাবার দায়িত্ব তাঁদেরই সব থেকে বেশি। শুধু তাঁদের নিজেদের আত্মপক্ষ সমর্থন (defend) করলেই চলবে না, অবস্থাটা কি তা জনতাকে শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি থেকে, সংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক বিচারবিশ্লেষণ করে দেখাতে হবে। দেখাতে হবে, কী সেই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত ত্রুটি, যে ত্রুটি ও দুর্বলতা এমন মারাত্মক রূপে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল যে তাকে প্রতিহত করা গেল না। কী গণচেতনা, কী রাজনৈতিক দলগুলির আভ্যন্তরীণ দলীয় শক্তি, কোনও ক্ষমতার দ্বারাই আমরা তাকে প্রতিহত করতে পারলাম না। এত বড় বড় সব রাজনৈতিক দলের নেতারা — আপনারা যাঁদের বক্তৃতা শুনে কথায় কথায় হাততালি দেন, গলায় মালা দেন, বিশ্ববিজয়ী নেতা বলে মনে করেন, যাঁদের বাণী শোনবার জন্য আপনারা ছুটে আসেন — তাঁরা এমনই ক্ষমতাবান যে, জনসাধারণের রক্ত দিয়ে গড়া এমন একটা সংগ্রামের হাতিয়ার যা জনসাধারণই তাঁদের হাতে তুলে দিল, সেটাকে রক্ষা করবার মতো প্রজ্ঞা (wisdom) এবং ক্ষমতা তাঁরা দেখাতে পারলেন না। স্বভাবতই এতবড় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়েও যুক্তফ্রন্ট কেন টিকে থাকতে পারল না , আপনারা এটা ঠিকভাবে বুঝতে চান। কারণ যুক্তফ্রন্ট চলে গেল, এবার কংগ্রেস আবার ফিরে আসুক — এটা আপনারা শুধু নয়, কোনও গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষই চান না। তাই আপনারা চান — আবার যুক্তফ্রন্ট হোক, আবার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তি পুনরুজ্জীবিত হোক এবং তারা পশ্চিমবাংলায় সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিক এবং গণআন্দোলন এবং শ্রেণীসংগ্রামগুলিকে, মানুষের ন্যায্য দাবিগুলি নিয়ে লড়াইগুলিকে, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াইগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাক।

কিন্তু, কংগ্রেসকে বা কোন দুষমন শাসক সম্প্রদায়কে শুধুমাত্র ভোটের জোরে হটিয়ে দিয়ে, যে কোনও একটা মোর্চাকে বা যুক্তফ্রন্টকে একবার গদিতে বসিয়ে দিতে পারলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায় — একথা যে ঠিক নয়, সেটা দু'দুবার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে গদিতে বসানোর পর যে সংকটে আপনারা পড়েছেন, তার দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। এই যুক্তফ্রন্ট সরকার গড়ে উঠেছিল কী ভাবে ? কতকগুলি দল যারা একক শক্তিতে কংগ্রেসকে হারাতে পারে না, তারা এক হয়ে যুক্তভাবে একটা যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেছিল। কিন্তু তাদের মনোভাবটা অনেকটা এরকম ছিল যে, আমরা যে যাই রাজনীতি করি না কেন, সবাই মিলে যাহোক করে কংগ্রেসকে তো আগে হটিয়ে দিই, তারপর কি হবে সবাই মিলে ঠিক করে নেব। অর্থাৎ, তাঁরা শুধু ব্যবসায়ীর মতো হিসেব করেছিলেন যে, আগে কংগ্রেসকে হটিয়ে নিজেরা উজির, নাজির, মন্ত্রী হই, পরে সব দেখা যাবে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আসলে যুক্তফ্রন্ট মানে কি শুধু এই? আপনারা, জনসাধারণ, যুক্তফ্রন্ট কি এই জন্য বানিয়েছিলেন? নেতাদের যার যাই হিসেব থাক না কেন,

আপনারা নিশ্চয়ই কেউই এই কারণে যুক্তফ্রন্টকে ভোট দেননি। যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠেছিল বাস্তব অবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে। কী সেই বাস্তব রাজনৈতিক অবস্থা?

ইংরেজ চলে গিয়ে দেশ স্বাধীন হবার পর কংগ্রেস যখন একচ্ছত্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল, মানুষ আশা করেছিলেন, কংগ্রেস সব সমস্যার সমাধান করবে। এই আশায় বেশ কিছুদিন পর্যন্ত অনেক লোক কংগ্রেসের সঙ্গে ছিল। যাঁরা কিছু বুঝতেন তাঁদের মধ্যেও এরকম ধারণা ছিল যে, সমস্ত সমস্যার মীমাংসা না করলেও, অন্তত দেশকে খানিকটা দূর পর্যন্ত কংগ্রেস এগিয়ে নিয়ে যাবে, জনসাধারণের ও সমাজজীবনের কিছু কিছু সমস্যার সমাধান করবে। তার জন্য বিশ বছর তাঁরা সময় দিয়েছেন। মানুষ এ নিয়ে প্রশ্ন করলে কংগ্রেসি নেতারা চিৎকার করে বলেছেন — 'ব্রিটিশ শাসনের এত বছরের জঞ্জাল পরিষ্কার করতে সময় লাগবে। আমাদের সময় দাও, এত সহজে এত বছরের পরাধীনতার গ্লানিকে দূর করা যায় না। হঠাৎ করে, ম্যাজিক করে দেশের উন্নতি করা যায় না।' মানুষ শুনে গেছেন, বিরক্ত হয়েছেন। তবু দিনের পর দিন, বছরের পর বছর সেই একই কথা তাঁরা শুনে গেছেন। শুনতে শুনতে একটা সময় মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। বিশ বছর ধরে একদিকে তাঁরা এইসব বক্তৃতা শুনেছেন, আর এরই পাশাপাশি কংগ্রেসি রাজত্বে কংগ্রেসি শাসকদের শ্রেণীচরিত্র, শোষণমূলক চরিত্রকে প্রকাশ করার জন্য যে আন্দোলনগুলো ধীরে ধীরে সমাজের অভ্যন্তরে দানা বেঁধে উঠছিল — তার বহিঃপ্রকাশ আমরা এই পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন গণআন্দোলনের মধ্যে দেখেছি। বার বার আন্দোলনের তুফান এসেছে, আন্দোলনের ময়দানে মানুষ নেমেছে, পুলিশ গুলি চালিয়েছে, মিলিটারি দিয়ে তাকে দমন করার চেষ্টা করেছে। স্বাধীনতার পর থেকে এত লড়াই, এত কোরবানি, এত আন্দোলন ভারবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনেও পশ্চিমবাংলায় হয়েছে কি না, ইতিহাস যাঁরা পড়েন তাঁরা তার মীমাংসা করবেন। আমি তার মধ্যে যেতে চাই না।

এই আন্দোলনগুলো থেকে একটা কথা পরিষ্কার হয়ে উঠছিল — তা হলো এই যে, কংগ্রেসকে মোকাবিলা করার মত এককভাবে কোনও বিপ্লবী বা গণতান্ত্রিক দল বা শক্তি বা অন্যান্য নানা মতাদর্শের সব দল মিলেও কোন যুক্তফ্রন্ট আজও সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে গড়ে ওঠেনি। অথচ আমাদের সমস্যাটা শুধু পশ্চিমবাংলার নয়, কোন একটা গ্রামের বা একটা থানার বা জেলার সমস্যাও নয়। গোটা ভারতের সমস্যার সাথে পশ্চিমবাংলার জনজীবন, সমাজ, অর্থনীতি, আদর্শ, নৈতিকতা, শিল্পোদ্যোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রের সমস্ত সমস্যাই ওতোপ্রোতভাবে জড়িত এবং গোটা ভারতের সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে নানা দলের ইস্যুভিত্তিক মিলিত যে 'যুক্তমোর্চা' বা 'ফ্রন্ট' গড়ে উঠেছে, তাও কখনই একটা স্থায়ী রূপ নেয়নি, বা তার মধ্যে বিভিন্ন দলের সমাবেশ এক থাকেনি, যদিও বামপন্থী দলগুলি সবসময়ই সেখানে মূল শক্তি হিসাবে কাজ করেছে।

যেমন ধরুন, পশ্চিমবাংলার এই যে যুক্তফ্রন্ট, এতে গণতান্ত্রিক কিছু পার্টি রয়েছে, যারা সরাসরি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিশ্বাস করে, গণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে চায়, মোটা মোটা ভাষায় অন্তত অত্যাচারের বিরুদ্ধে, জোতদারদের বিরুদ্ধে, মালিকদের জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলে। অবশ্য লড়াই তারা কতদূর করবে জানিনা। কিন্তু মানুষ আজও বিশ্বাস করে, এঁরা সৎ মানুষ, এঁরা গণতন্ত্রের জন্য লড়বে, কিছু করবে। আবার এরকম পার্টিও আছে যুক্তফ্রন্টে — যারা সমাজবাদের কথা বলে, কিন্তু মার্ক্সবাদ মানে না। তারা জাতীয় সমাজতন্ত্রের মতো একটা সমাজবাদ মানে বা সমাজতন্ত্রের একটা কল্পনা করে। এরা শ্রেণীসংগ্রামের কথা বলে, মালিকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলে, কলেকারখানায়, ট্রেড ইউনিয়নে, কিছু কিছু চাষী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এরা কিছু কিছু লড়ালড়িও করে। এ ধরনের সমাজবাদী দলও আমাদের যুক্তফ্রন্টের মধ্যে রয়েছে। আবার এর মধ্যে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী বলে আরেক দল আছে, যারা নিজেদের সাম্যবাদী বলে না। তারা মনে করে, বিশ্বের সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে তারা যুক্ত নয়। তার সঙ্গে তারা সম্পর্ক রাখতে চায় না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রমিক ঐক্য, বা দুনিয়ার মজদুর এক হও — এই শ্লোগানের উপর তাদের বিশেষ আস্থা নেই। দুনিয়ার মজুর-চাষীদের সঙ্গে তাদের একাত্মতা তারা হয়তো চিন্তায়, আদর্শে মনে করে, কিন্তু বাস্তবে জাতীয় ক্ষেত্রে এদের মার্ক্সবাদের প্রয়োগ অনেকটা জাতীয়তাবাদী দলের মতো। এরকম একটা দলকে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দল বলা যায় কিনা, সে

আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু, এই ধরনের জাতীয় ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী কিছু কিছু দলও আমাদের যুক্তফ্রন্টের মধ্যে আছে। আর রয়েছে, যাঁরা খোলাখুলিভাবে নিজেদের বিপ্লবী বলেন, মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী বলেন এবং বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের অংশীদার হিসাবে নিজেদের ভাবেন, নিজেদের সরাসরি কমিউনিস্ট বলে প্রচার করেন। এ রকম কয়েকটি দল রয়েছে। আবার, এর মধ্যেও দু'তিন ভাগ রয়েছে। আমরা রয়েছি, সি পি আই রয়েছে, সি পি এম রয়েছে। সি পি এম অবশ্য আজও হয়তো নিজেদের আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের অংশীদার হিসাবেই ভাবে, যদিও তারা নিজেরা, না চীন না রাশিয়া, কোন পক্ষ বা অথরিটির দ্বারা স্বীকৃত না হওয়ার ফলে আমার ধারণা, খানিকটা 'জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টি' ধরনের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের দিকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে পা বাড়াচ্ছে। যদিও এরূপটি আজই পরিষ্কার হয়ে উঠছে না, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এটিও পরিষ্কার হয়ে উঠবে বলে আমার ধারণা।* তা এরাও রয়েছে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে।

তাহলে, এই যে সব মিলেমিশে একটা যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠেছিল, এটা কেন? সেটা কি শুধু এই কারণেই যে, একলা কেউ একটা নির্বাচন পুরো লড়তে পারবে না, একক শক্তিতে কংগ্রেসের মোকাবিলা করতে পারবেনা, কংগ্রেসকে পরাস্ত করতে পারবে না, তাই জোটপাট খাটিয়ে যে করেই হোক সমস্ত শক্তিগুলিকে একত্রিত করে একটা হাওয়া তুলে — কংগ্রেস বিরোধী একটা যে হাওয়া আছে, সেই কংগ্রেস বিরোধী মনোভাবকে (anti-Congressism) কাজে লাগিয়ে 'আমরা হেন করে দেব, তেন করে দেব' এইসব কথা বলে যেনতেন প্রকারেণ ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য? আর শুধু এই ভেবে যে মানুষগুলো বিশেষ কিছু বোঝেনা, তাদের ধৈর্যের সীমা বিশ বছর ধরে শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছেছে, তারা যাহয় একটা কুটোর মতন পেলেও ধরতে চাইবে এবং সব পার্টিগুলো যখন এক হয়ে গেছে তখন তাদের বাক্সে গিয়ে তাঁরা ভোটটা দিয়ে দেবেন? আমরা জানি, সাধারণ সাদামাটা মানুষ এইভাবেই কথাগুলো বলেন। তাঁরা বলেন, 'আরে মশাই, আপনারা সব এতগুলো দল, এতগুলো মত, সবাই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়ছেন, আপনারা সবাই এক হয়ে যান, অত ঝগড়াঝাটি, অত মতবাদের লড়ালড়ি, অত তর্কাতর্কি, অত সূক্ষ্ম বিচার করবার আমাদের সময় নেই। আমরা মশাই খেটেখাওয়া মানুষ, আমাদের অত তত্ত্বটত্ত্বের দরকার নেই। আপনারা সব এক হোন। এক হলেই দেখবেন কংগ্রেসকে আমরা টুপ করে ফেলে দিয়েছি।' বাস্তবে ঘটলোও তাই। আমরা সব এক হয়ে গেলাম। ওঁরা টুপ করে কংগ্রেসকে ফেলে দিলেন। আমরা সব গদিতে বসলাম। তারপর আমরা আবার ওঁদের সেই টুপ করে ফেলে দেবার মতো নিজেরাই টুপ করে ভেঙে গেলাম।

তাহলে, এ থেকে কী দেখা গেল ? দেখা গেল যে, ফাঁকি দিয়ে হয় না। ফাঁকি দিয়ে কোন কাজ হয়না। 'রাজনীতি বুঝতে চাইনা, অত জটিলতায় আমাদের দরকার নেই' — আপনাদের এভাবে ভাবলে চলবে না! কেননা স্বাধীনতা তো আপনার নিজের দরকার, মুক্তি তো আপনার দরকার। দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদের উচ্ছেদ চাই, গণআন্দোলন করতে হবে, শ্রেণীসংগ্রাম করতে হবে, অত্যাচারের অবসান ঘটাতে হবে, বেকারদের চাকরি দিতে হবে, কৃষির আধুনিকীকরণ করতে হবে, দেশকে শিল্পোন্নত করে গড়ে তুলতে হবে — এ সব নিয়ে আপনারা স্বপ্ন দেখেন, এসবও আপনারা চান। কিন্তু তবুও রাজনীতি নিয়ে আপনারা মাথা ঘামাবেন না, সেটা আপনারা রাখবেন ভাড়া করা রাজনৈতিক নেতাদের জন্যে, মাইনে করা চাকরের মতন ভাড়া করা নেতাদের জন্যে। আপনারা নেতাদের উপর নির্ভর করে থাকবেন। নেতারা যদি আপনাদের ডোবায় আপনারা ডুববেন, নেতারা যদি কোনও দিন আপনাদের তোলে আপনারা উঠবেন। এ কেমনতর কথা ? এ রকম করে কত দিন চলবে? এই করে গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় দেশের মানুষ রক্ত দিয়েছে, অথচ ক্ষমতা তুলে দিয়েছে কংগ্রেসের হাতে। এই করে বিশ বছর ধরে কংগ্রেসি শাসনের যাঁতাকলে মানুষ পিষ্ট হয়েছে। এই করেই মানুষ না বুঝে কংগ্রেসকে হটালেন, কিন্তু ক্ষমতা কার হাতে তুলে দিলেন তার বাছবিচার করলেন না। কোন কিছু করবার আগে বিচার করে করবার কথা বললেই আপনারা যে বলেন, 'অতো কথা আমরা বুঝতে চাই না, অতো যুক্তি বিচার করবার দরকার আমাদের নেই' — এ চলবে না। এ অন্ধতাকে আপনাদের দূর (fight) করতে হবে, এ অন্ধতার বিরুদ্ধে আপনাদের লড়তে হবে।

---

* এই বিশ্লেষণ বর্তমানে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই সত্য বলে প্রমাণিত।

গণআন্দোলনে নেতারা মার খায় না — এ কথাটা আপনারা মনে রাখবেন। আমরা যারা নেতা হয়ে বসেছি, তাদের গা বেঁচে যায়, লাঠি পড়ে আপনাদেরই ঘাড়ে। নেতারা ক'জন মার খান? কাজেই, যদি আবার কোন আন্দোলনের পথে আসতে হয় এবং তা আসতেই হবে, আজ হোক বা কালই হোক, আন্দোলনের পথে আবার আপনাদের আসতেই হবে। তাহলে, রাজনীতির চর্চাটাও আপনাদের নিজেদেরই করতে হবে। আন্দোলন আপনারা করছেন। আন্দোলনে মারও আপনারা খাচ্ছেন, লোকসান আপনাদের হচ্ছে, অথচ যে রাজনীতির কূটকচালে নীতির অলিগলির পথে তা হচ্ছে — সেই রাজনীতিকে বুঝতে গেলে, তাকে ধরতে হলে যে রাজনীতির প্রয়োজন আছে, সেই রাজনীতির চর্চা আপনারা করবেন না। কেন কী ঘটছে, কোন পার্টির কী নীতি, যুক্তফ্রন্ট কীভাবে গড়ে ওঠার দরকার, যুক্তফ্রন্টের আচরণবিধি কী হওয়া দরকার, যুক্তফ্রন্টের কর্মনীতি কী হওয়া দরকার — এগুলোর জন্যে যে রাজনীতিটা বোঝার দরকার, লক্ষ্য করা যাচ্ছে, 'যুক্তফ্রন্ট' 'যুক্তফ্রন্ট' বলে যাঁরা চেল্লাচিল্লি করছেন, তাঁদের মধ্যেও এইসব নিয়ে কোন গভীর উদ্বেগ (serious concern) কাজ করছেনা।

তাই ফলটা কী দাঁড়াচ্ছে? যুক্তফ্রন্ট চাই, যুক্তফ্রন্ট গড়তে হবে — সব দলই বলছে। কারণ যুক্তফ্রন্ট ছাড়া কারও চলছে না, কেউ একা চলতে পারেনা। মানুষ যুক্তফ্রন্ট চাইছে। তাই দেখবেন, যারাই যুক্তফ্রন্ট ভাঙলো নিজেদের মধ্যে লড়ালড়ি করে, তারাই কিন্তু আবার বলছে, যুক্তফ্রন্টকে রক্ষা করতে হবে, যুক্তফ্রন্টকে ভাঙার চক্রান্ত ব্যর্থ করতে হবে। আমাদের দলের কর্মীরা শ্লোগান দিচ্ছে, 'যুক্তফ্রন্ট বিরোধী চক্রান্ত ব্যর্থ করুন', 'ভাঙলো কে, সি পি এম আবার কে'। আবার সি পি এম-এর কর্মীরাও মিছিল বের করছে, শ্লোগান দিচ্ছে, 'যুক্তফ্রন্ট বিরোধী চক্রান্ত ব্যর্থ করুন', 'যুক্তফ্রন্টকে রক্ষা করুন', 'ভাঙলো কারা, অমুক, অমুক, অমুক যারা', 'তারা ছাড়া আবার কারা'। আপনারা জনসাধারণ দু'দলের মাঝখানে পড়ে একবার এদিকে চাইছেন, একবার ওদিকে চাইছেন। কে যে ভাঙলো, বোঝবার উপায় নেই। আপনারা শেষপর্যন্ত ত্যক্তবিরক্ত হয়ে নির্ভর করছেন ঈশ্বরের উপর। ভাবছেন, 'যা হয় একটা কিছু যদি হয় হল, না হলে আর কি করা যাবে? আমরা যারা সাধারণ মানুষ, আমরা তো চিরকালই মার খাই। আবার যদি ভোটের সময় আসে, তখন কষ্ট করে গিয়ে, হয় এই পক্ষে না হয় ওপক্ষে ঢুকে ভোটাভুটি করে হয় ওকে জেতাব, নাহয় ফেলব'। এই হচ্ছে আপনাদের মানসিকতা। আমার দৃঢ় অভিমত, আপনাদের এসব মনোভাব পরিত্যাগ করতে হবে। ঘটনা দ্রুত এগোচ্ছে। আপনারা যাঁরা সাধারণ মানুষ তাঁদের উপর সমস্ত জিনিষ নির্ভর করছে। ভোটে আপনাদের কাছেই যেতে হয়। আপনাদের জনশক্তির উপর নির্ভর করেই যেমন ভোটের লড়াই হয়, তেমনি গণআন্দোলনও হয়। গণআন্দোলনই হোক, আর ক্ষমতা দখলের বিপ্লবের স্বপ্নই হোক, সবই আপনাদের উপর নির্ভর করে। নেতারা মগজের কাজটা করে, দল মগজের কাজটা করে, রাস্তাটা বাতলায়। অন্ধকারে চলার সময় যেমন একটা বাতির দরকার হয়, সেই বাতিটা, টর্চটা না থাকলে গর্তে পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে, তেমনই নেতৃত্ব, দল, রাজনীতি হচ্ছে সেই টর্চ নামক জ্ঞান, যে জ্ঞানের দ্বারা এই আন্দোলনের যে অন্ধকারময় রাস্তার অলিগলি, তা আমরা দেখে দেখে চলতে পারি।

তাহলে, যে কথাটা আমি বলতে চাইছিলাম, সব কিছু বিচারবিশ্লেষণ করে বুঝতে হবে। আমরা যে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলছিলাম এবং যেটা গড়ে উঠেছিল, আপনারা জানেন, সেটা কংগ্রেসের দাপটের মধ্যে মানুষের সহ্যের সীমা যখন একটু একটু করে শেষ হয়ে যাচ্ছিল, আর তার সাথে সাথে একটু একটু করে গণআন্দোলন গড়ে উঠছিল, তার মধ্যে দিয়েই এই যুক্তফ্রন্টের শক্তিটা গড়ে উঠছিল। আর এই গণআন্দোলনগুলোর চেহারা কী ছিল? না, সেই গণআন্দোলনগুলোর শরিক এই যে সব পার্টিগুলোকে দেখছেন, এই পার্টিগুলোর মধ্যে বেশীরভাগ পার্টি, তার তার নিজস্ব রাজনীতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, মূল আদর্শ উদ্দেশ্য যাই থাকুক, জনতার কাছে তা পরিষ্কার থাকুক বা না থাকুক, তারা সকলে মিলেই একত্রে যে আন্দোলনগুলো করছিল, সেই সম্মিলিত লড়াই, সেই ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের সঙ্গে জনতার একটা একাত্মতা গড়ে উঠছিল।

পশ্চিমবাংলায় এই ফ্রন্ট প্রথমে কিছু পার্টিকে নিয়ে শুরু হয়েছিল। প্রথমে এই যুক্তফ্রন্টে কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না। তারপর তারা এল। আবার কমিউনিস্ট পার্টি দুটো ভাগে ভাগ হবার পর, তাদের মধ্যে একটা পার্টি যুক্তফ্রন্টে ছিল, আর একটা পার্টি ছিল না। পরে সেই পার্টিটাও এল। তারপর

'৬৭ সালের নির্বাচনের আগে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে যখন বাংলা কংগ্রেস গঠিত হল, নির্বাচনের পর কয়েকটি বামপন্থী দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও, বিশেষ করে আমাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও, তাদের যুক্তফ্রন্টে নেওয়া হল। আমরা বলেছিলাম যে, কংগ্রেস থেকে ওরা বেরিয়ে এসেছে, ওদের আগে পরীক্ষা হোক, আগে ওরা গণআন্দোলনে পরীক্ষা (test) দিক, লড়াই করুক, তারপর এদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সহযোদ্ধা হিসাবে কিছুদূর পর্যন্ত নিয়ে চলা যায় কিনা, তা বিচার করার পর তারা এদের নিক। কিন্তু ইলেকশনের রাজনীতির আশু লাভালাভের দিকে তাকিয়ে (pragmatic consideration) এই কমিউনিস্ট পার্টি এবং মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বাংলা কংগ্রেসকে যুক্তফ্রন্টে সরাসরি টেনে নিয়ে এল, যুক্তফ্রন্টের মিটিং-এ তাদের ডেকে নিয়ে এল। ফলে, রাতারাতি বাংলা কংগ্রেস প্রগতিশীল হয়ে গেল। আজ বাংলা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যা নয় তাই বলে সিপিএম গালাগালি দিচ্ছে, কিন্তু এই বাংলা কংগ্রেসকে, কংগ্রেস ছেড়ে আসার পরে কোন পরীক্ষানিরীক্ষা না করেই যুক্তফ্রন্টে আহ্বান করে নিয়ে এসেছিলেন এই প্রমোদবাবুরা নিজেরাই। একথা তো অস্বীকার করলে চলবে না। আমরা তো তাদের ডেকে আনিনি।

কিন্তু এসে গিয়ে আমরা চাই বা না চাই, প্রমোদবাবুরা চান বা না চান, জ্যোতিবাবুরা চান বা না চান, তারা পশ্চিমবাংলার জনমানসে এই গণআন্দোলনেরই একটা পার্টি হিসাবে পরিচিত হয়ে গেছে। এটা প্রমোদবাবুরাই করে দিয়েছেন। গত নির্বাচনেও 'দাশগুপ্ত ফর্মূলার' দ্বারা তাদের ৩৩টি সীট পাওয়ার বন্দোবস্ত তাঁরাই করে দিয়েছিলেন, আমরা করে দিইনি। তার বিনিময়ে তাঁরা ব্যবসাদারদের মতো হিসাব করেছিলেন, তাঁদের নিজেদের কটা সীট বাড়বে। তখন সিপিএম নেতারা এদের রাজনীতির চর্চা করেননি। "বাংলা কংগ্রেস জোতদারের দল" — এসব কথা তখন তাঁদের বলতে শুনিনি। সে কথায় আমি পরে আসছি। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, জোতদারের দল যদি বাংলা কংগ্রেস হয়ে থাকে তো সে কি আজ হয়েছে? সে তো যেদিন তাকে তাঁরা ডেকে নিয়ে এসেছিলেন, সেদিনই ছিল। তাহলে তার সঙ্গে তাঁরা ঐক্য করেছিলেন কেন? জনগণের মনে প্রশ্নগুলো এইভাবে ওঠা দরকার। যদি জোতদারের দল বলেই তার সঙ্গে তাঁরা ঐক্যের বিরোধী হন, ঐক্য করতে না চান এবং ওটাকে ভিত্তি করেই যদি ঐক্য ভাঙেন, তাহলে আমার প্রশ্ন, সে কি জোতদারের পার্টি আজ হয়েছে? সে কি যুক্তফ্রন্টে বসার পর রাতারাতি জোতদারের দল হয়েছে? সে তো আগেই ছিল! তাতে তো তার সঙ্গে ঐক্য করতে তাঁদের আপত্তি হয় নি? তাতে তো 'দাশগুপ্ত ফর্মূলা' তৈরি করে সেই জোতদারের পার্টিকেই গাদা গাদা সীট দিয়ে 'দ্বিতীয় বৃহত্তম পার্টি' করে দিতে তাঁদের মত বিপ্লবীদের(?) বাধেনি! তাহলে এখন 'জোতদারের পার্টি' কথাটা তাঁরা তুলছেন কেন? বিচার করে, বিশ্লেষণ করে, এমনভাবে তাঁদের বলা দরকার যাতে মানুষের মগজ গুলিয়ে না যায়, মানুষ যাতে বুঝতে পারে। কিন্তু তাঁরা তা না করে যা বললেন, সে তো গোলমাল করে দেওয়ার কথা, উত্তেজিত করে দেওয়ার কথা। একটা প্রশ্ন তুলে দেওয়া হল, আর এমনভাবে প্রচার চালানো হল যাতে মানুষ অন্ধ আবেগে কাজ করে, যাতে তাদের মধ্যে যুক্তি কাজ না করে। এ রাজনীতি তো জনগণের রাজনীতি নয়! এ তো অন্ধতার রাস্তা! অন্ধতার রাস্তা তো কমিউনিস্টরা, মার্ক্সবাদীরা চর্চা করেনা। এ কারা চর্চা করে? করে ফ্যাসিস্টরা। ফ্যাসিস্টরা চায় যত বেশি অন্ধতা, তত বেশি উগ্র মতান্ধতা (More the blindness, more the fanaticism)। অন্ধতা যত বাড়বে, উগ্র মতান্ধতা তত বাড়বে। এ তত্ত্ব ফ্যাসিস্টরা মানে। তাই তারা চায় সারা জাতটা অন্ধ গোঁয়ারের মতো হয়ে যাক। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, অন্ধতা এনে দাও, একটা হুজুগ এনে দাও, শ্লোগান তুলে দাও, নানারকম কথা তুলে আসল কথাগুলোকে চাপা দিয়ে দাও এবং জনতাকে উত্তেজিত করে নিয়ে যাও। তার ফলে কি হয় ? জনতাও প্রচারে প্রচারে উন্মত্ত হয়ে যায়, উন্মত্ত হয়ে দৌড়াতে থাকে। দৌড়ে গিয়ে তারা গর্তে পড়বে, না কোথায় পড়বে তা খেয়াল করেনা। যেমন করে অতবড় ঐতিহ্যময় দেশ জার্মানি ডুবে গেল। এই জার্মান দেশটা ভারতবর্ষের মতো পিছিয়ে-পড়া দেশ নয়। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, শিল্পে পৃথিবীর মধ্যে একটা অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ। এতবড় একটা দেশের মানুষগুলোকে, জ্ঞানী লোকগুলোকে, পাগলের মত ক্ষেপিয়ে তুলে হিটলার দেশটাকে কোথায় নিয়ে গেল ! আর তারই পরিণতিতে আজ জার্মান জাতির কী অবস্থা! দেশটা দু'ভাগ হয়ে গেল, তার সে ইজ্জত চলে গেল।

কাজেই অন্ধতা কমিউনিস্টদের রাস্তা নয়। গরম করে

দেওয়া, খামোকা উত্তেজিত করে দেওয়া, মগজটাকে গুলিয়ে দেওয়া, আলোচনায় অধৈর্য হওয়া, উত্তর না করে গালগালি করা — এগুলি প্রতিক্রিয়াশীলদের রাস্তা। যাদের আদর্শগত দুর্বলতা রয়েছে, তারাই উত্তেজনার রাস্তা নেয়, কেবল শ্লোগান দেওয়ার রাস্তা নেয়, শ্লোগান তুলে তত্ত্বকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু যারা দুর্বল নয় তারা প্রশ্নের জবাব দেয়, প্রশ্নকে চাপা দেয় না, প্রশ্নের উত্তর দেয়। কাজেই আমার প্রথম বক্তব্য, বাংলা কংগ্রেস জোতদারের দল বলেই কি যুক্তফ্রন্ট ভেঙেছে ? জোতদারের দল বলে তার সঙ্গে ঐক্য করা চলবে না — এই যদি প্রশ্ন হয়, তাহলে জোতদারের পার্টি কি সে আজকে হয়েছে ?

দ্বিতীয়ত, কোন নীতিগত কারণে বাংলা কংগ্রেস যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে যায়নি। কোন নীতিগত প্রশ্নে সিপিএম আর বাংলা কংগ্রেসে বিরোধিতা ঘটেনি। বরং নীতিগত বহু প্রশ্নে সিপিএম, বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে একসঙ্গে আমাদের বিরোধিতা করেছে। যেমন পুলিশ বাজেট বাড়ানোর প্রশ্নে। পুলিশ বাজেট বাড়ানোর প্রশ্নে চিরকালই আমাদের বক্তব্য ছিল, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ধারক ও বাহক বলে যে পুলিশকে বলা হয়, সেই পুলিশের জন্য বাজেট বাড়ানো আমরা কোনোমতেই সমর্থন করতে পারিনা। কংগ্রেস আমলেও কংগ্রেস একটানা পুলিশ বাজেট বাড়িয়ে গেছে কোন্ যুক্তিতে? না, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য, সমাজবিরোধীদের দমন করার জন্য, অপরাধমূলক কার্যকলাপ দমনের জন্য ইত্যাদি ইত্যাদি যেসব যুক্তি অত্যাচারী শাসকরা (despot) দেয়, শয়তানরা দেয়, সেইসব যুক্তিতে। প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থায় সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে এই অজুহাতেই পুলিশ বাজেট বাড়ানো হয়। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, আর গুণ্ডা দমনের অজুহাতে পুলিশকে আরও শক্তিশালী করার জন্য বরাবর কংগ্রেস পুলিশ বাজেট বাড়িয়ে গেছে। আসল কথা হল, জনগণের উপর কংগ্রেস আস্থা হারিয়েছিল, কাজেই গণআন্দোলনকে দমন করতে হলে, নিজেদের গদিটাকে নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব করতে হলে পুলিশ বাজেট বাড়ানো ছাড়া তাদের আর অন্য পথ খোলা ছিল না। তাই গণআন্দোলন দমনের আসল উদ্দেশ্য নিয়ে, 'গুণ্ডা ও সমাজবিরোধীদের দমন করতে হবে', এই যুক্তি খাড়া করে কংগ্রেস পুলিশ বাজেট বাড়িয়েছে। তা এ তো স্বৈরাচারি শাসকদের (despot) রাজনীতি, শয়তানদের রাজনীতি, প্রতিক্রিয়াশীলদের রাজনীতি। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে যে বিপ্লবীরা ইলেকশনে গিয়ে সরকার গঠন করে সরকারকে গণআন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চায়, তারা কি পুলিশের শক্তি বাড়ানোর জন্য পুলিশের বাজেট বাড়ায়? অথচ জ্যোতিবাবুও তাঁর পুলিশের শক্তি বাড়ানোর জন্য বাজেট বাড়ানোর সুপারিশ করলেন ঠিক সেই একই যুক্তিতে যে, 'সমাজবিরোধীদের, গুণ্ডাদের দমন করতে হবে'! শুধু একটু টুইস্ট করে বললেন, তাঁরা নিজেরা তো সমাজবিরোধী বাড়ার জন্য দায়ী নন। অর্থাৎ, তিনি বলতে চাইলেন, এর জন্য কংগ্রেস দায়ী, কারণ কংগ্রেস বিশ বছর ধরে সমাজবিরোধী তৈরি করেছে, তাদের পোষণ করেছে। তাই সব দায় পড়লো গিয়ে কংগ্রেসের ঘাড়ে। অর্থাৎ উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে পুলিশ বাজেট বাড়ানোর মূল প্রশ্নটাকেই জ্যোতিবাবু ঘুরিয়ে দিলেন। প্রশ্ন ছিল, পুলিশ বাজেট না বাড়ানোর, আর তিনি বললেন, কংগ্রেসের জন্য সমাজবিরোধী বেড়েছে।

কী অদ্ভুত রাজনীতি! কী অদ্ভুত যুক্তি করার ভঙ্গি! কংগ্রেস দেশকে সর্বস্বান্ত করেছে ঠিকই, কিন্তু আমরা যদি দেশের নৈতিক অধঃপতনের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের চেতনা, গণআন্দোলনের আদর্শবাদ, গণআন্দোলনের নৈতিকতা, রাজনৈতিক কর্মীদের চারিত্রিক সততা, মিথ্যার আশ্রয় না নেওয়া — এইগুলি তুলে ধরতে পারতাম, তাহলে সমাজের উপর তার একটা প্রভাব পড়তো। কিন্তু এইরকম যুক্তির কারচুপি, যা জ্যোতিবাবুর মতো একজন নেতার মুখ থেকে দেশের মানুষ পেলেন — এই রকম যত রকমের কারচুপি, যত রকমের শয়তানি, যত রকমের মিথ্যাচার এনে দিয়ে আমরা কি দেশের আবহাওয়াকে বিষাক্ত করিনি? কংগ্রেস নিশ্চয়ই করেছে, কিন্তু আমাদের দায়িত্ব তো আমরা এড়াতে পারিনা। আমাদের কাজ আমরা করিনি। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সে নৈতিকতা আমরা তুলে ধরতে পারিনি। একাজ যারা করবে, তাদের নিজেদের চরিত্রের আগে পরিবর্তন আনতে হবে। সমস্ত দুর্বলতাকে পরাস্ত করার মতো সৎ সাহস তাঁদের চাই। জ্যোতিবাবুদের কাছ থেকে সেটা আশা করা অন্যায়। আমি আশা করিনা।

আমি বলেছি বহুবার যে, তাঁরা দুর্নীতি দুর্নীতি করে চেঁচাচ্ছেন, অথচ '৬৬ সালের একটা বক্তৃতায় এ ব্যাপারে

আমি কিছু কথা বলেছিলাম, পড়ে দেখবেন। তখনও আমরা ক্ষমতায় আসিনি। আমি বলেছিলাম যে, তাঁরা বলছেন, দুর্নীতির জন্য কংগ্রেস দায়ী, কারণ দুর্নীতি কংগ্রেস এনেছে। এ কথাগুলো ঠিক, কিন্তু এইটাই সবটুকু নয়। পুরো সত্য এর মধ্যে নেই। আমি বলেছিলাম, দুর্নীতি আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে (Corruption has become the national characteristic)। কংগ্রেস তো ক্ষমতায় গিয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েছে, স্বাধীনতা লড়াইয়ের সময় নয়। কিন্তু বামপন্থীরা তো ক্ষমতায় যাবার আগেই, বামপন্থী আন্দোলনের মধ্যেই কর্মীদের নৈতিক অধঃপতন, চারিত্রিক অধঃপতন, রাজনৈতিক নেতাদের চারিত্রিক অধঃপতনের যে বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে, তাতে দুর্নীতি তো আমাদের ঘরে ঘরে। আয়নায় নিজেদের মুখ দেখুন। কাজেই উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাচ্ছেন কেন? এ প্রসঙ্গ না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু যে কথা বলছিলাম, জ্যোতিবাবু কংগ্রেসী কায়দায়, স্বৈরাচারিদের কায়দায়, সমাজবিরোধী দমনের অজুহাত তুলে বললেন, পুলিশ বাজেট বাড়াতে হবে। আমরাই তখন তার প্রতিবাদ করেছি, আমরাই তার বিরোধিতা করেছিলাম। বাংলা কংগ্রেস বরং সমর্থন জানিয়েছিল তাঁদের।

আমরা বলেছিলাম, গণআন্দোলনের উপর নির্ভর করে চলছে যুক্তফ্রন্ট। ফলে তাকে তো আর আজ পুলিশ দিয়ে গণআন্দোলন দমন করতে হবে না। যুক্তফ্রন্ট তো পুলিশের উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে নেই। যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি নিজেরাই যদি নিজেদের না ডোবায়, তাহলে জনশক্তির যে সমর্থনের উপর যুক্তফ্রন্ট দাঁড়িয়ে আছে, স্বয়ং ঈশ্বর এলেও তাদের ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবে না। তাই পুলিশের উপর তো যুক্তফ্রন্টকে নির্ভর করতে হবে না। তাহলে, গণআন্দোলনকে দমন করার জন্য পুলিশের যে ক্ষমতা কংগ্রেস বাড়িয়ে গিয়েছিল, যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে অর্ধেক করে দেওয়ার দরকার ছিল। সত্যিই কি সমাজবিরোধী কার্যকলাপ দমনের জন্য পুলিশের শক্তি আর বাড়ানোর দরকার ছিল? এটা জ্যোতিবাবুরা সব দিক থেকে বিচার করে দেখেছিলেন? দেখেননি। তা না করে ঐ স্বৈরাচারিদের, শয়তানদের যুক্তিতেই তাঁরা পুলিশ বাজেট বাড়ালেন। আমরা বিরুদ্ধতা করলাম। বাংলা কংগ্রেস সিপিএম-এর সঙ্গে গেল। সি পি এম-এর মন্ত্রী কলকাতায় একশ'কুড়িটার উপর মদের দোকানের লাইসেন্স ঢালাও ইস্যু করে গেলেন। আমাদের দল তার বিরোধিতা করেছে। বাংলা কংগ্রেস করেনি। পঁচাত্তর বিঘা থেকে জমির সিলিং কমানোর প্রস্তাব আমরা দু'চারটি বামপন্থী দল করেছিলাম। সি পি এম আর বাংলা কংগ্রেস দু'দলই তার বিরোধিতা করেছিল। তাহলে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে কোথায় সিপিএম-এর নীতিগত পার্থক্য? কোথায় সে ঘটনা বা উদাহরণ, যে সিপিএম কোনও একটা নীতি চালু করতে গেছে, বাংলা কংগ্রেস তার বিরোধিতা করেছে? বা, সিপিএম একটি কৃষিসম্পর্কিত বিল চালু করতে গিয়েছিল, বাংলা কংগ্রেস তার বিরোধিতা করেছে? এখন হাজারটা গল্প বানিয়ে তাঁরা ছাড়তে পারেন, কিন্তু সে কোন্ বিল — নাম বলুন তাঁরা, কোন্ সে নীতি, কোন্ সে নিয়ম তাঁরা চালু করতে গিয়েছেন যা বাংলা কংগ্রেস বিরোধিতা করেছে? বরঞ্চ যুক্তফ্রন্টকে আড়াল করে বিড়লার সঙ্গে সিপিএম সমঝোতা করেছে, চুক্তি করার চেষ্টা করেছে, গোপন চুক্তি করবার চেষ্টা করেছে। যুক্তফ্রন্টকে যে ঐতিহ্য, যে সংগ্রামের উপর, যে নৈতিকতার উপর আমরা গড়ে তুলতে চাইছিলাম, জনসাধারণ চাইছিল, তার উপরে সিপিএম আঘাত করেছে। আর কী করেছে? পুলিশ বাজেট বাড়িয়েছে। সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে তাদের সাপোর্ট বাড়ানোর জন্য, তাদের খুশি করার জন্য দশটা টাকা তাদের পাইয়ে দিয়েছে। এই তো? দেশের কথা, দেশের বেকারদের কথা, চাষবাসের উন্নতির কথা, গরিব চাষীর কথা — কোনও কিছুই তাদের বাজেট ঘোষণায় প্রতিফলিত হয়নি।

তাহলে, বাংলা কংগ্রেস কি কোনও নীতিগত বিরোধের কারণে বেরিয়ে গেছে? বাংলা কংগ্রেস বেরিয়েছে উত্যক্ত হয়ে। বাংলা কংগ্রেসের বেরিয়ে যাওয়া নিয়ে সিপিএম অনেক উল্টোপাল্টা প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। অজয়বাবু যখন বেরিয়ে গেলেন তখন তাঁর সম্পর্কে ওদের প্রচার দাঁড়াল — 'ঐতো উনি ১৯৬৭ সালে এ রকম করেছিলেন, আবার পদত্যাগ করে এরকম করলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।' আর কিছু লোক আছে যাঁরা এই উল্টোপাল্টা প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে বলতে থাকেন — হ্যাঁ, অজয়বাবুর এটা ঠিক হয় নি, অন্যায় হয়েছে। বামপন্থী মনোভাবাপন্ন জনসাধারণের প্রতি আমার অনুরোধ, ঠিকই অজয়বাবুদের একাজ উচিত হয়নি, অবিবেচনাপ্রসূত হয়েছে, অন্যায় হয়েছে। আমরা এ কাজ

সমর্থন করিনা। কিন্তু এই আলোচনা করে আপনারা, আসলে যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরে যাদের রাজনীতির জন্য, যাদের ঐক্য বিনষ্টকারী (disruptive) কার্যকলাপের জন্য উত্যক্ত হয়ে বাংলা কংগ্রেস বেরিয়ে গেল, যদি তাদের অপরাধটিকে, কু-রাজনীতিটাকে আলোচনা না করেন, যদি তাদের চেপে না ধরেন, তাহলে আবার যদি কোনও দিন ঐক্য গড়ে ওঠে, তাদের সঙ্গে ঐক্য হয়, তাহলে তখনও কিন্তু মূল যে খোদ কারণটা যুক্তফ্রন্টের ঐক্যে ফাটল ধরালো, সেই ফাটল ধরানোর রাজনীতিটা, তার শক্তিটা থেকেই যাবে, তাকে দূর করতে পারবেন না।

এটা কী ধরনের ঘটনা যে, পাড়ার ভিতরে কতগুলো লোক উৎপাত করছে, গুণ্ডামি করছে, কখনো বাড়ির মধ্যে ঢুকে শাসানি, হামলা, এমনকি মারধোর পর্যন্ত করছে, ঘরদোর তছনছ করে দিচ্ছে, কিন্তু যাঁর বাড়িতে হামলা হচ্ছে তিনি পুলিশের সাহায্য চাইলে পুলিশ সাহায্য দিচ্ছে না, দিলেও নামমাত্র দিচ্ছে, বা দেওয়ার নাম করেও বাস্তবে কার্যক্ষেত্রে কিছু করছেনা। ঘটছে না এরকম ঘটনা? সর্বত্র ঘটছে। ধরুন, এইরকম একটা অবস্থায় হামলায় আক্রান্ত সেই ব্যক্তিটি চূড়ান্ত হতাশাগ্রস্ত হয়ে লড়াইয়ের সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর আপনারা যাঁরা বাইরে থেকে ব্যাপারটা দেখেছেন তাঁরা যদি তখন আলোচনা করতে বসেন এবং বেরিয়ে যাওয়া লোকটির ওপরেই দোষ চাপিয়ে বলতে থাকেন, ও কেন বিবাগী হয়ে গেল, তাহলে যারা গুণ্ডার কাজ করছিল, গুণ্ডামি করছিল, যাদের গুন্ডামীর কারণেই সে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হল তাদের সে গুন্ডামীকে, অপকর্মকেই পুরস্কৃত করা হয় না কি ? এর দ্বারা আসল সত্যটাকে চাপা দেওয়া হয় না কি ?

তৃতীয়ত এ বিষয়ে আমি আর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করছি। তা হচ্ছে, সিপিএম-এর মূল রাজনৈতিক প্রস্তাবটা কি ? কথায় কথায় জ্যোতিবাবু তো লোকেদের এই কথা শোনান যে, তাঁরা একটা দায়িত্ববান পার্টি। খুব ভালো কথা! কিন্তু এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আমার মনে আসছে। তা হচ্ছে, এই দলের নেতারা কি নিজেদের দলের রাজনৈতিক প্রস্তাবটা পড়েন? নাকি তাঁদের দলের রাজনৈতিক প্রস্তাব লেখেন একদল পণ্ডিত লোক, নেতারা তা পড়েও দেখেন না। রোজ যখন কথা বলেন, বক্তৃতা দেন, আচরণ করেন, লেকচার দেন তখন খেয়ালও করেন না, তাঁদের মূল রাজনৈতিক প্রস্তাবটা কী?

তাঁদের কংগ্রেসে গৃহীত মূল রাজনৈতিক প্রস্তাবে ভারতবর্ষের বিপ্লবের স্তরকে বলা হয়েছে, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর, যে বিপ্লব তাঁরা করবেন বলে বলেন। তাঁরা বলছেন, সাম্রাজ্যবাদ, বড় বড় পুঁজিপতি এবং সামন্ততন্ত্রবিরোধী বিপ্লবই হচ্ছে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদ, বড় বড় পুঁজিপতি এবং সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এই যে বিপ্লব হবে, সে বিপ্লবের সহযোদ্ধা কারা? এখানে বিপ্লবের শ্রেণীবিন্যাস (co-relation of forces) বলতে গিয়ে বলা হচ্ছে, এ বিপ্লবে শ্রমিক, চাষী, নিম্ন-মধ্যবিত্তের সাথে জাতীয় বুর্জোয়া এবং ধনী চাষী হচ্ছে বিপ্লবের মিত্র শক্তি। এই ধনী চাষী বলতে তাঁরা কাকে বলেন ? গ্রামে যারা ধনী চাষী, তাদেরই তো জোতদার বলা হয়। তাহলে পশ্চিমবঙ্গে জোতদার কারা? জোতদাররা তো সেই ধনী চাষীরাই। তাহলে, সিপিএম-এর রাজনৈতিক প্রস্তাব অনুযায়ীই এই ধনী চাষীরাই, অর্থাৎ জোতদাররাই সেই বিপ্লবের সহযোদ্ধা। তাহলে তাদের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব অনুযায়ী বাংলা কংগ্রেস যদি জাতীয় বুর্জোয়ার দলও হয়, অর্থাৎ জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর দলও হয় এবং জোতদারের পার্টিও হয়, ক্ষমতা দখলের লড়াই পর্যন্ত বহুদূর এই ধনী চাষীরা, মানে জোতদাররাও তাদের সহযোদ্ধা। এ কথা তাঁরাই তাঁদের রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলেছেন। তাই আমার অবাক লাগে যে, জোতদারের দল হলে আমাদের, আমরা যারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলি, তাদের আপত্তি হতে পারে, কিন্তু সি পি এম-এর আপত্তি হবে কেন?

এ ব্যাপারে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, এই মুহূর্তে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্তরে যে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কথা ভাবা হচ্ছে, সেই গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, আর সিপিএম-এর জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বমুহূর্তের যে ফ্রন্ট, এই দুটো ফ্রন্ট তো এক নয়। দেশ যখন গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোর মধ্যে দিয়ে বিপ্লবের প্রস্তুতির পথে এগোচ্ছে তখনকার গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের চেহারা একরকম; আর গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলতে চলতে যখন তা সংগঠিত সংঘবদ্ধ রূপ নিয়েছে, যখন একটার পর একটা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বিপ্লবের সংগঠন দানা বেঁধে উঠেছে, বিপ্লবের নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে,

তখন ফ্রন্টের চেহারাটা কী? সে ফ্রন্ট হচ্ছে বিপ্লবের আগের মুহূর্তে শ্রেণীগুলোকে, অর্থাৎ সমগ্র 'জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের' যে শ্রেণীগুলি সেই শ্রেণীগুলিকে নিয়ে গঠিত ফ্রন্ট। অর্থাৎ বুঝতে হবে, তখন শ্রমিক, চাষী, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, বুর্জোয়া এবং ধনী চাষীর উপরে কমিউনিস্ট পার্টির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একমাত্র এরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পরই গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষিত হবে। অর্থাৎ, একদিকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি যাদের উচ্ছেদ করা হবে, অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টি বা শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি — এই দুইয়ের মাঝখানে জনতাকে বিভ্রান্ত করার জন্য যত মেকি বিপ্লবী দল আছে, গণতান্ত্রিক এবং সমাজবাদী পার্টি আছে, সেই পার্টিগুলোর যে বিচ্ছিন্ন প্রভাব রয়েছে জনশক্তির উপর সে সম্পর্কে জনতার মোহমুক্তি ঘটিয়ে, সেই দলগুলোকে জনশক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন (isolate) করে, যখন বিরাট জনশক্তিকে কমিউনিস্ট পার্টির একক নেতৃত্বের অধীনে আনা সম্ভব হবে, একমাত্র তখনই গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রয়োজন নিঃশেষিত হবে। অর্থাৎ তখন আর যুক্তফ্রন্টের মতো কোনও ফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না, তখন হবে সরাসরি ক্ষমতা দখলের লড়াই। তাহলে, যতক্ষণ পর্যন্ত সরাসরি ক্ষমতা দখলের লড়াই করার মতো অবস্থা না আসছে, শ্রমিক, চাষী, নিম্ন-মধ্যবিত্তদের উপর দলের নেতৃত্ব কায়েম করে মেকি পার্টিগুলোকে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করার কাজ সম্পূর্ণ না হচ্ছে, ততক্ষণ সি পি এম-এরই রাজনৈতিক প্রস্তাব অনুযায়ী গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট যা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বর্তমান স্তরে, অর্থাৎ 'যুক্তফ্রন্ট' রাজনীতির বর্তমান স্তরে গড়ে উঠেছে, তার তাৎপর্য রয়েছে, প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এমতাবস্থায় বিষয়টা ভেবে দেখুন। ওঁদের দলের কর্মী, সমর্থক ও নেতারা যদি কেউ এখানে উপস্থিত থাকেন তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ — আমাদের সম্পর্কে যত শত্রুতাপূর্ণ মনোভাবই আপনাদের থাকুক না কেন, আপনারা আমাদের যাই মনে করুন — ফ্যাসিস্ট মনে করুন, জোতদারের দল মনে করুন, পুঁজিপতিদের দালাল মনে করুন, কিন্তু একবার ভেবে দেখুন যে, আপনাদেরই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনৈতিক প্রস্তাব অনুযায়ী যে শ্রেণীবিন্যাসের কথা বলা হয়েছে, আন্দোলনের সহযোদ্ধা হিসাবে শ্রেণীগুলোকে যেভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেই সহযোগী শ্রেণীগুলিকে নিয়ে 'জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' বা 'শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্ট' গড়ার যে প্রস্তাব আপনারা নিয়েছেন, সেই 'শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্টে' তো জাতীয় বুর্জোয়ারাও থাকতে পারে এবং জোতদাররাও থাকতে পারে।

তা নাহলে বলতে হবে, আপনাদের রাজনৈতিক প্রস্তাব আপনারা পাল্টেছেন। কারণ একথাটা সকলেই জানেন যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যে কোনও ফ্রন্টেরই চরিত্র হচ্ছে শ্রেণীচরিত্র — তা সে যুক্তফ্রন্টই হোক, জাতীয় ফ্রন্টই (National Front) হোক, আর সর্বহারা যুক্তফ্রন্টই (Proletarian United Front) হোক। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষকের শ্রেণীগত ঐক্যের (class alliance) যে সর্বহারা ইউনাইটেড ফ্রন্ট হয়, সেটা যেমন শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্ট, তেমনি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গোটা দেশ জুড়ে যে জাতীয় ফ্রন্ট (National Front) হয় সেটাও শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্ট। শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্টের মার্ক্সবাদী তাৎপর্য (connotation) এই। এটাই শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্টের একমাত্র মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যা। তাহলে সিপিএম যে বিপ্লবের কথা বলছে, সেই বিপ্লব তো জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। কাজেই তত্ত্বগত দিক দিয়ে তাদের বিপ্লব যদি জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব হয়, তাহলে তাদের শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্টে তো জাতীয় বুর্জোয়া এবং জোতদাররা থাকতে পারে। যে বিপ্লবটির কথাটা সিপিএম নেতারা তাঁদের সম্মেলনে বলেছেন, সেটা যদি তাঁরা যথার্থই বিশ্বাস (mean) করেন, তাঁদের রাজনৈতিক প্রস্তাবটা যদি কাগজে লেখার জন্য না থাকে, যদি বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য থাকে, সেটা যদি সত্য হয়, তাহলে জোতদারদের দলের সঙ্গে মিলতে সিপিএম নেতাদের তো আপত্তি হবার কথা নয়। আমাদের বরঞ্চ আপত্তি হবে, কারণ আমরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিশ্বাসী। তাহলে এটাতো তাঁদের কোনও কার্যকরী কথা নয় যে, 'ওরা জোতদারের পার্টি, ওরা প্রতিক্রিয়াশীল'। জোতদাররা তো তাঁদের বিপ্লবের বর্তমান স্তরে প্রতিক্রিয়াশীল নয়। জাতীয় বুর্জোয়ারা এবং ধনীচাষীরা তো তাঁদের বিপ্লবের সহযোদ্ধা, হতে পারে তারা দোদুল্যমান মিত্র (vascillating ally), কিন্তু বিপ্লব পর্যন্ত তারা তাঁদের বিপ্লবের মিত্রশক্তি। তাহলে এটা কিরকম কথা যে, তাঁদের বিপ্লবের মিত্রশক্তি সেই জোতদারদের বিরুদ্ধেই তাঁরা লড়ছিলেন এবং আন্দোলন চলতে চলতে এখন তাদের বিরুদ্ধে শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্ট করার কথা বলছেন ?

দেখুন, কী রকম পরস্পরবিরোধী (contradictory) কথা ! আর দেখুন, তাঁদের কর্মীরা একবাক্যে অন্ধের মতো তাই মেনে চলেন। ফ্যাসিজমের লক্ষণ আপনারা জানেন যে, সেখানে এতটুকুও যুক্তিবিচারের জায়গা নেই। যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির ওপর সিপিএম-এর হামলার সমর্থনে প্রমোদবাবু থিসিস দেন — জোতদারদের বিরুদ্ধে তাঁরা লড়ছিলেন, আর যুক্তফ্রন্টের এই দলগুলি জোতদারের পার্টি, তাই এদের সঙ্গে সিপিএম-এর লড়ালড়ি লেগেছে। আর এই জন্যই এই দলগুলি সিপিএম-এর বিরোধিতা করছে। তাই আজ আর যুক্তফ্রন্টের কোন কার্যকারিতা নেই। এখন শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে। এই হল প্রমোদবাবুর নয়া থিসিস। আর একে স্বীকার করে নেন তাঁদের দলের কর্মী-সমর্থকরা অন্ধের মতো। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, এই নয়া থিসিস তাঁরা তাঁদের পুরোনো জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনৈতিক প্রস্তাব বাতিল করে গ্রহণ করলেন কবে, তাতো আমরা জানিনা। দেশের মানুষকেও তাঁরা জানাননি। জানলে, তাঁদের একথা আমরা বুঝতে পারতাম এবং অন্যদিক থেকে বিচার করতাম। প্রশ্ন করতাম, এই শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্টটা আসলে কী? আগেই বলেছি যে, এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে কোনও ফ্রন্টই শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্ট ছাড়া হয় না। কিন্তু প্রমোদবাবুর মতে হয়, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এমন ফ্রন্ট হয়, যা শ্রেণীভিত্তিক নয়। শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্ট বলতে এখন উনি বাস্তবে যা বলছেন, রাজনৈতিকভাবে সেটার একটাই মানে হয় তা হচ্ছে, সর্বহারা যুক্তফ্রন্ট (Proletarian United Front)। আর তাই যদি তাদের সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে তাদের বিপ্লবটাতো আর জনগণতান্ত্রিক থাকে না! এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা আপনাদের সামনে রাখছি। ওঁদের ভাষায় ওঁরা বলছেন, যুক্তফ্রন্টের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, এখন শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্ট গড়তে হবে। তাহলে শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্ট বলতে ওঁরা যেটা বলছেন তার মানে দাঁড়ায়, ওঁদের পার্টির নেতৃত্বে সঠিক বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে ওঠার ফলে মেকি পার্টিগুলো সব জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে তাঁদের নেতৃত্বে বিপ্লবী শক্তিগুলির সমাবেশ ঘটেছে। তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে তো ক্ষমতা দখলের লড়াই সরাসরি শুরু করার সময় এসে গেছে, পার্লামেন্টারি রাজনীতি সম্পর্কে জনতার মোহমুক্তি ঘটে গিয়েছে। তাহলে আবার ছ-সপ্তাহের মধ্যে 'ইলেকশান চাই' বলে তাঁরা চেঁচাচ্ছেন কেন?

এ কথাগুলো আলোচনা করছি এই জন্য যে, এতবড় একটা দল, অন্যেরা যে যাই ভাবুক, আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং আমাদের দল মনে করে যে, এতবড় একটা দল, আজও তার অন্তত পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে একটা মস্ত বড় ভূমিকা রয়েছে। আমরা মনে করি, সম্মিলিত আন্দোলনে যদি তাঁরা এবং আমরা আবার একত্র না হতে পারি — ওঁদের রাজনীতির ভুলেই হোক, অথবা আমাদের রাজনীতির ভুলেই হোক, যদি আমরা নিজেরা পরস্পর লড়ালড়ি করি —তাহলে ফলটা মারাত্মক হবে। গণআন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত হবে। জনশক্তি দ্বিধাবিভক্ত হবে। মানুষ হতাশার (frustration) মধ্যে পড়বে। আর তার ফাঁক দিয়ে, গোলওয়ালকরের মতো যে বাঘটা ওত পেতে রয়েছে তারা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে আসর জমাবে এবং চরমপন্থী রাজনীতি এ রাজ্যে মাথাচাড়া দেবে।* তাহলে, এ দুর্যোগ থেকে পশ্চিমবাংলাকে তো রক্ষা করতে হবে। কিন্তু কীভাবে? সেটার জন্যই এত কথা আলোচনা করা।

বিক্ষোভ আমাদেরও যথেষ্ট আছে, মার আমরাও খেয়েছি। সিপিএমের রাজনীতির একটা লাইনও আমরা সমর্থন করি না। কিন্তু তবুও আমি মনে করি, গণআন্দোলনের শক্তি হিসাবে তারা আজও কাজ করছে, তার কার্যকারিতা আজও আছে। কিন্তু সিপিএম যে রাজনীতির চর্চা করছে তা তো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐক্য ধ্বংস করার রাজনীতি, মারাত্মক রাজনীতি, যা গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে রক্ষার পরিবর্তে তাকে ভিতর থেকেই বিনষ্ট করে দিচ্ছে। সেটা তারা সচেতনভাবে করছে, জেনে বুঝে করছে, না অজ্ঞাতসারেই করছে — সেসব প্রশ্ন গৌণ। আমরা দেখছি, ওদের রাজনীতিটি এমন যে, এমনটা না করে তারা পারে না। আর এইভাবেই প্রমোদবাবুরা ডোবাচ্ছেন। দেখুন, তাঁদের রাজনীতির স্ববিরোধীতা (contradiction) কী অদ্ভুত! 'মার্ক্সবাদী' প্রমোদবাবু আমাদের ঠাট্টা করে বলেন, আমরা নাকি 'আগ-মার্কা' কমিউনিস্ট, মানে 'খাঁটি'। আমরা তো বলিই যে, আমরা খাঁটি। তাই উনি বিদ্রূপ করে এ কথাটা বলেন, আমাদের কানে আসে। তাঁরা আমাদের

* আর এস এস-জনসংঘ-বিজেপি'র উত্থান সম্পর্কে তাঁর এই ঐতিহাসিক সতর্কবাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রতিভাত হচ্ছে।

বলেন, ওটা তো একটা 'আগ মার্কা' পার্টি। বলুন, যত ইচ্ছা বিদ্রূপ করুন, কিছু যায় আসে না। 'ব্যাঙের ছাতার মতো আমরা গজিয়েছিলাম' — এও তো আমরা অনেক দিন শুনেছি, অনেকের কাছ থেকেই শুনেছি। শুনতে শুনতে আজ আমরা পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে, ভারতবর্ষের রাজনীতিতে নিজেদের শক্তিতে, আদর্শের জোরে, নিষ্ঠার জোরে একটা জায়গা করে নিয়েছি। কারোর কথায় কিছু আসে যায় না। বিদ্রূপ করে, মিথ্যা রটনার দ্বারা কিছু লোককে কিছুদিনের জন্য বিভ্রান্ত করা যায়, মানুষকে চিরকাল বিভ্রান্ত করা যায় না। জার্মানিতে গোয়েবলসের রাজনীতি অন্তত দশটা-বারোটা বছরের জন্য মানুষকে বিভ্রান্ত করে জার্মানির সর্বনাশ করেছে। কিন্তু দুনিয়ার মানুষকে, বা জার্মানির মানুষকে চিরকাল বিভ্রান্ত করে রাখতে পারেনি। তাই বিদ্রূপে আমাদের কিছু আসে যায় না।

কিন্তু একটা কথা আমরা প্রমোদবাবুকে, তাঁর দলের কর্মীদের এবং জনসাধারণের সামনে বিচারের জন্য রাখতে চাই। আমি আগেই বলেছি, রাজনীতি এবং তত্ত্বের আলোচনা হলে তাঁদের খারাপ লাগলে তো চলবে না। প্রমোদবাবুরা বলছেন, ফ্রন্টের প্রয়োজন নিঃশেষিত হয়ে গেছে, অর্থাৎ যে যুক্তফ্রন্ট আমরা গড়ে তুলেছিলাম তার কার্যকারিতা নাকি নষ্ট হয়ে গেছে। তাহলে আমার প্রশ্ন, নানান গণতান্ত্রিক শক্তি, মেকি সমাজবাদী, মেকি মার্ক্সবাদীদের সঙ্গে তাঁদের মানে সিপিএমের মতো 'সাচ্চা মার্ক্সবাদী' পার্টির গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট যেটা গড়ে উঠেছিল, সে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ার ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা কী ছিল? প্রয়োজন তো ছিল এটাই যে — বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্ব জনগণের বৃহত্তর অংশের উপর প্রতিষ্ঠিত হবার আগে পর্যন্ত, অর্থাৎ জনগণের ওপর বিপ্লবী নেতৃত্ব বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত পার্লামেন্টারি রাজনীতির কার্যকারিতা থেকে গেছে, যেটা নকশালপন্থীরা বিশ্বাস করে না। নকশালপন্থীরা বিশ্বাস করে না যে, এদেশে পার্লামেন্টের একটা অস্তিত্ব (existence) আছে, পার্লামেন্টারি রাজনীতি বা প্রতিষ্ঠানগুলোর (institution) একটা অবস্থান আছে। অথচ বাস্তবে এটা একটা ঘটনা যে, এদেশে পার্লামেন্টারি রাজনীতি অবস্থান করছে। কতটা এই পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা, সেটা অন্য প্রশ্ন। কিন্তু পার্লামেন্টারি মোহ, যাকে আমরা বলি ভোটের রাজনীতির মোহ, জনগণের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে ছড়িয়ে রয়েছে।

বিপ্লবীরা, মার্ক্সবাদীরা সবাই বলেন, ভোটে কিছু হবেনা। আমরাও তাই বলি। আমরা, যারা নিজেদের মার্ক্সবাদী বলি কক্ষনো বলিনা যে, আমরা ভোটের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি বা বিপ্লব আমরা চাই না। এ কথাটা আমরা কেউ বলি না। কারণ বললে পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন মানুষ থেকে আমরা তৎক্ষণাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। কেউ যদি ভোটের রাজনীতির চোরাগলিতে পা দিয়েও থাকি, মুখে অন্তত বিপ্লবকে আমাদের জপতেই হবে। এ না করে কোনও উপায় নেই। কিন্তু এ প্রশ্ন থাক। এখন দেখা যাক, এ বিষয়ে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব কী বলে? মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব বলে যে, মার্ক্সবাদীরা পার্লামেন্টে যায় এজন্য যে, জনগণের মধ্যে পার্লামেন্টারি মোহ রয়েছে। এই যে পার্লামেন্টারি মোহ কথাটা বলা হয়, এ কথার মানে কী? এ কথার মানে হচ্ছে, গণতান্ত্রিক শক্তির উপর, শ্রমিক-চাষী-মধ্যবিত্ত ও বিপ্লবের সহযোদ্ধা শ্রেণীগুলির উপর এখনও মেকি গণতন্ত্রী, মেকি সমাজতন্ত্রী, মেকি বিপ্লবীদের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে, এবং তারাই এই পার্লামেন্টারি মোহ বিস্তার করে রেখেছে। তার মানে, জনগণের বিপ্লব করবার পরিস্থিতি তখনও গড়ে ওঠেনি, বা বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে সরাসরি ক্ষমতা দখলের পূর্বমুহূর্তে ফ্রন্টের যে চরিত্র হয়, তেমন একটা ফ্রন্ট তৈরি করার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় নি। অর্থাৎ, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সেই স্তরে এখনও আমরা রয়েছি, যে স্তরে পার্লামেন্টারি রাজনীতি সম্পর্কে মোহমুক্তি ঘটানোর জন্য নির্বাচনে আমাদের অংশগ্রহণ করতে হবে, ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠ (majority) হলে সরকার গঠন করতে হবে, সরকার গঠন করে সেই সরকারকে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার স্বার্থে যথাসাধ্য ব্যবহার করতে হবে। পুলিশকে সংযত (restrain) করে ফ্রন্টকে গণআন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। এই জন্যই তো আমরা নির্বাচনে যাই, ভোটে দাঁড়াই। তাহলে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব বলছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না শ্রমিক-চাষী-মধ্যবিত্ত বা বিপ্লবের সহযোদ্ধা শ্রেণীগুলো থেকে মেকি গণতন্ত্রী, মেকি সমাজবাদী, মেকি বিপ্লবীদের বিচ্ছিন্ন করে বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীরা গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তুলে ভোটে অংশগ্রহণ করে।

কিন্তু প্রমোদবাবুরা একদিকে বলছেন, যুক্তফ্রন্ট মানে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যে স্তরে যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠেছিল সে স্তর পার হয়ে গেছে। আর এই মধ্যবর্তী পার্টিগুলো — মানে সি পি এমের ভাষায় আমরা, যারা অন্যান্য বামপন্থী দল তারা, বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে চলে গিয়ে গণআন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। মানে, বিপ্লবী জনগণ থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। অর্থাৎ, ক্ষমতাসীন যে শোষক সম্প্রদায়কে বিপ্লবী মার্ক্সিস্ট পার্টি উচ্ছেদ করবে তার মাঝখানে আমরা কতকগুলো আপসকামী শক্তি (compromising force) রয়ে গেছি, — যারা বিপ্লব আর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আপস করে জনতাকে বিভ্রান্ত করে পার্লামেন্টারি মোহ বিস্তার করছিলাম, ওদের তত্ত্ব অনুযায়ী সেই দলগুলি, মানে আমরা সব এক্সপোজড্ (exposed) হয়ে গেছি। আমাদের সঙ্গে ওঁদের বিরোধ এই নিয়ে যে ওঁরা বলছেন, সেই পার্টিগুলোর থেকে বা গণআন্দোলন থেকে সি পি এম বিচ্ছিন্ন হয়নি, গণআন্দোলন থেকে আমরা সব বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। জনগণের ওপর সি পি এম-এর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে এবং ক্ষমতা দখলের পূর্বমুহূর্তের সেই বিপ্লবী ফ্রন্টের অধীনে জনগণের সমাবেশ ঘটেছে। আবার অন্যদিকে সেই সিপিএমই স্লোগান তুলছে, ছয় সপ্তাহের মধ্যে ইলেকশান চাই !

তার মানে, তাঁরা নিজেরাই বলছেন, জনগণের মন থেকে ইলেকশানের মোহ কাটেনি। আর কাটেনি বলেই তাঁদের ভোটে অংশগ্রহণ করে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করতে হবে, পার্লামেন্টারি রাজনীতির মুখোশ খুলে দিতে হবে। অথচ ইলেকশানের মোহ কাটেনি, এই কথার দ্বারা তাঁরাই আবার স্বীকার করছেন যে, যে পার্টিগুলোর সঙ্গে তাঁরা ঐক্য নষ্ট করে দিলেন, তাদের প্রভাব আজও জনতার উপর বিস্তৃত। কারণ, তাদের প্রভাব আছে বলেই জনতার মধ্যে পার্লামেন্টারি মোহ আছে। এ কথার মানে দাঁড়ায়, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সেই স্তরে আজও তাঁরা আছেন, আমরা রয়েছি, যে স্তরে যুক্তফ্রন্ট বা গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কার্যকারিতা আছে। তাহলে কোন্ কথাটা তাঁদের ঠিক ? এই কি তাঁদের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব (theory)? না কি, তাদের মনে যা আসে তাই তাঁরা বলছেন? তা, এইসব ব্যক্তি বিপ্লবের নেতা ! যদি এতবড় একটা পার্টির, যার উপর কত কিছু নির্ভর করে, সেই পার্টির নেতৃত্বের মতো দায়িত্বশীল পদে যদি এইসব নেতারা বসে থাকেন, তাহলে সে দেশের রাজনীতি ঠিক পথে চলবে কি করে বলতে পারেন? তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই দলের কর্মীদের কাজ হচ্ছে, নেতারা যা বলছেন সেই অনুযায়ী কর্তা ভজে যাওয়া। দুঃখের সাথে, তাহলে আমি বলব, তাঁরা কীর্তনের দলে যোগ দিন, হরিনাম সংকীর্তন করুন — রাজনীতির, বিশেষ করে বিপ্লবী রাজনীতির বিচার করবেন না, আলোচনা করবেন না।

আর একটা কথা। যুক্তফ্রন্ট, মানে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, তার বাস্তব রূপটা কি? গণতান্ত্রিক অন্দোলনের কোন্ স্তরে থাকলে তবে ইলেকশনে লড়াই চলে? যখন ইলেকশনে লড়তে আবার তাঁরা যাচ্ছেন, তখন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কোন্ স্তরে তাঁরা আছেন? এবং সেই স্তরে এইসব গণতান্ত্রিক (democratic) পার্টি, মেকি সমাজবাদী বা তাঁদের কথা অনুযায়ী আমাদের মতো মেকি বিপ্লবী পার্টিগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে জনশক্তিকে যদি তাঁদের পিছনে তাঁরা টেনে এনে থাকেন, তো তাঁদের সেই জনশক্তির চেহারা কি? যেমন ওয়ার্কার্স পার্টি — তাঁদের কৃপায় ভোট না পেলে যাদের দাঁড়াবার জায়গা নেই; মার্ক্সিস্ট ফরোয়ার্ড ব্লক, নাহয় সুধীন কুমারের* দল যাদের তুলে ধরে রাখলেও ডুবে যায় — এইসব হচ্ছে তাঁদের মিত্রশক্তি (ally)! আর যারা প্রকৃতই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তি, তারা তাঁদের ফ্রন্টের থেকে বাইরে রয়ে গেল। এস ইউ সি সম্পর্কে তাঁরা উল্টোপাল্টা প্রশ্ন তুলে দিচ্ছেন। বলছেন, এস ইউ সি কি রকম হয়ে গেল, সেতো ভালই ছিল, মার্ক্সবাদী ছিল, আমাদের বিরুদ্ধে চলে গেল। মানে তাঁদের বিরুদ্ধে যখন চলে গেল, তখন এস ইউ সি আর মার্ক্সবাদী নেই। কিন্তু এস ইউ সি কেন চলে গেল? কেন এস ইউ সি'র মতন একটা পার্টি, যে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের সময় সমস্ত ঝঞ্ঝাট কাঁধে করে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছিল, তাঁরা নিজেরা বরঞ্চ কেঁপেছিলেন, এই পার্টিটা ছোট হয়েও কাঁপেনি, সেই পার্টিটা কেন সরে গেল? তাহলে বন্ধুকে তাঁরা ধরে রাখতে জানেন না, এমন রাজনীতি তাঁরা করেন। তাঁরা নিজেরাই বন্ধুত্বকে নষ্ট করেন। সম্মিলিত আন্দোলনকে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের ভুল রাজনীতি আর

* আর সি পি আই-এর একটি অংশের নেতা

কর্মীদের অন্ধ আচরণের দ্বারা জেনে হোক বা না জেনে হোক ভিতর থেকে নষ্ট করে দেন।

আর একটা কথা ভেবে দেখুন। সি পি এম নিজেদের মার্ক্সবাদী পার্টি বলে, বড় পার্টি বলে নিজেদের দাবি করে। তাদের দাবি যদি ঠিক হয়, তাহলে তারা মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বলুক, আজ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যে স্তরে আমরা রয়েছি, সে স্তরে একক শক্তিতে কোনও পার্টি সমস্ত জনশক্তিকে তাদের পিছনে এনে বাকি পার্টিগুলোকে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এক্ষুনি গণআন্দোলনকে তাদের নিজেদের নেতৃত্বে পরিচালনা করতে পারে কি? তাহলে, এই সময়ে যুক্তফ্রন্ট যদি ভেঙ্গে যায় কারোর কোন ভুল রাজনীতির জন্য, তাতে যে দলটি সত্যিকারের বিপ্লবী দল, যে দল বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে তার হবে সবচেয়ে বড় লোকসান। কারণ বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার যে প্রক্রিয়া, যে পদ্ধতিতে সমাজে এটা গড়ে উঠবে, সেটা হল — গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো সম্মিলিতভাবে লড়াই করতে করতে, লড়াইয়ের রাস্তায় চলতে চলতে মেকি পার্টিগুলো, সেই লড়াইয়ের আলোকে জনশক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকবে। এই বিচ্ছিন্ন করার যে বাস্তব রাজনীতি সেই রাজনীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম চালাতে পারলে তবেই একদিন এগুলি বিচ্ছিন্ন হবে। আর তখনই ব্যাপক মানুষের মধ্যে বিপ্লবের সমর্থনে মানসিকতা গড়ে উঠবে, সমস্ত জনশক্তি সেই পার্টির নেতৃত্বে হুড়মুড় করে এসে দাঁড়াবে। কোনও আপসকামী শক্তি (compromisong force) বা মেকি গণতন্ত্রীরা তাদের ইলেকশনের মোহ বিস্তার করে উল্টোপাল্টা বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। এই হচ্ছে বিপ্লবী দলের কাছে যুক্তফ্রন্টের কার্যকারিতা। তা এই যে সব দলগুলো, যাদের সিপিএম নেতারা মেকি মার্ক্সবাদী বা মেকি বামপন্থী মনে করেন, যথার্থই কি গণআন্দোলনের উপর তাদের প্রভাব নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে? তাদের ভূমিকা কি নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে? যদি হয়ে গিয়ে থাকে বলেই তাঁরা মনে করেন, তাহলে তো এটাই বুঝতে হবে যে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্তর উত্তরণ করে সরাসরি ক্ষমতা দখলের সময় এসে গিয়েছে। তাহলে তো ইলেকশনে যাওয়ার প্রশ্ন আর আসতে পারে না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, তাঁদের এ বিশ্লেষণ ঠিক নয়। আসলে কথাটা তাঁরা বলছেন, শুধু কর্মীদের সামনে বেকায়দায় পড়ে। যেমন বলা হচ্ছে, বাংলা কংগ্রেস জোতদারের দল। তাঁদের একটা কর্মীও প্রমোদবাবু বা জ্যোতিবাবুর কাছে এই প্রশ্ন করেন না যে, ওটা যদি জোতদারের দলও হয়, সিপিএম-এর রাজনৈতিক প্রস্তাব অনুযায়ী তার সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট করতে বাধা কোথায়? কারণ বাংলা কংগ্রেস তো জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের দোদুল্যমান মিত্র (vacillating ally) হিসাবে ক্ষমতা দখলের লড়াই পর্যন্ত থাকতে পারে। আর এই যুক্তফ্রন্ট তো হচ্ছে মাত্র একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফ্রন্ট। এ স্তরটি অতিক্রম করার পর তবেই না ক্ষমতা দখলের স্তরে পৌঁছানো যাবে! আর সরাসরি ক্ষমতা দখলের স্তরেই যদি তাদের, অর্থাৎ ধনী চাষী ও জাতীয় বুর্জোয়াদের মিত্র ভাবা যায় — তবে 'জোতদারের দল' বলে খেপিয়ে তোলা হচ্ছে কেন? আর এই জোতদারের দল কি বাংলা কংগ্রেস আজ হয়েছে? থাকলে আগেও ছিল। তবে তখন তাদের সঙ্গে ঐক্য করেছিলেন কেন?

তাই আমি সিপিএম নেতাদের কাছে আবার আবেদন করছি, তাঁরা ভেবে দেখুন, যুক্তফ্রন্ট গণআন্দোলনের একটা বাস্তবীকৃত ফল, গণআন্দোলনের একটা হাতিয়ার। এই যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলতে না পারলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সরাসরি ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের স্তরে উন্নীত করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় যে পার্টি বিপ্লবের কথা বলবে, তা সে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই হোক, বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবই হোক — জনশক্তিকে অন্যান্য মেকি পার্টিগুলির প্রভাব থেকে মুক্ত করে, জনতাকে নিজের নেতৃত্বে পরিচালিত করে ফ্রন্টের রূপকে যে পাল্টে দিতে চায়, যুক্তফ্রন্টের মধ্যে সেই পার্টির কার্যক্রম এবং রাজনীতিটা কী রকম হবে? একই সঙ্গে তাকে দুটো কাজ করতে হবে। একদিকে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে থেকে গণআন্দোলনগুলো পরিচালনা করতে হবে, সাথে সাথে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনা করতে করতেই আদর্শগত রাজনৈতিক সংগ্রামের পথে মেকি পার্টিগুলোকে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। এই দুটো কাজ প্রমোদবাবুরা একসঙ্গে করতে পারেন না এবং দুটো কাজের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক, অর্থাৎ 'বিরোধী শক্তির মধ্যে ঐক্য' (unity of opposite) কথাটার যথার্থ তাৎপর্য তাঁরা বুঝতেও পারেননি, প্রয়োগও (apply) করতে পারেননি। যথার্থ মার্ক্সবাদী না হলে একে বোঝাও যায় না

এবং রূপও দেওয়া যায়না। বিষয়টি আমি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছি।

যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন দলের মধ্যে বিরোধ থাকতে পারে এবং থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু যে প্রস্তাবটা এই যুক্তফ্রন্ট ভাঙার আগে আমরা উপস্থিত করেছিলাম সেই প্রস্তাবের ভূমিকায় (preamble) আমরা বলেছি, এই যে বিভিন্ন দলের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি, দলাদলি — এর জন্য ফ্রন্ট ভেঙে গেল এ আমরা মানিনা, বিশ্বাস করি না। কারণ দলে দলে মারামারি রাজনৈতিক আন্দোলনে অনেক হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে অনেক হয়েছে। অনুশীলন, যুগান্তর বা বিভিন্ন দল, তারা পরস্পর ফাটাফাটি করেছে। কিন্তু যখন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই এসেছে তখন সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছে। তাদের মধ্যে ঐক্য ভাঙেনি। পার্টি পার্টিতে লড়ালড়ি সত্ত্বেও তো ঐক্য ভেঙে যায়নি এবং কোন নীতিগত বিরোধেও ঐক্যে ফাটল ধরেনি।

আসল ব্যাপারটা হয়েছে এই যে, পুলিশকে, প্রশাসনযন্ত্রকে শিখণ্ডীর মতন কোথাও প্রত্যক্ষভাবে, কোথাও পরোক্ষভাবে সামনে খাড়া রেখে সিপিএম অপর দলগুলোর সংগঠিত এলাকায় হামলা করেছে। এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দলের নেতারা যুক্তি (argument) করেন, পুলিশকে যদি তাঁরা নিয়ন্ত্রণ (control) করে থাকেন, দলের স্বার্থে কাজে লাগিয়ে থাকেন, তবে অমুক জায়গায় তাদের কর্মী পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছে কি করে? এরকম উল্টোপাল্টা প্রশ্ন তুলেই আসল ঘটনা তাঁরা ধামাচাপা দিতে চান। সাধারণভাবে পুলিশ-প্রশাসনকে তাঁরা নিয়ন্ত্রণ (control) করেন বলে পুলিশ কোথাও তাদের সঙ্গে কোন সংঘর্ষে আসবে না, লড়ালড়ি করবে না, এ কোন কাজের কথা? কাজেই ওসব উল্টোপাল্টা কূটতর্ক করে বাস্তব ঘটনাকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। বাস্তব ঘটনা যেটা আজ সমস্ত মানুষ, সমস্ত দলগুলো বুঝতে পারছে, প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণ না রেখে যে সমস্ত ঘটনা প্রত্যহ ঘটে যাচ্ছে, তা হচ্ছে, সিপিএম-এর পক্ষ থেকে পুলিশকে-প্রশাসনকে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে (petty party interest) ব্যবহার করা হচ্ছে।

পুলিশের কথায় আমি পরে আসছি। আগে আমি স্কুল কমিটিগুলির কথা বলি। সেখানে কি হয়েছে ? শিক্ষাবিভাগে কী হয়েছে? সমস্ত স্কুল কমিটি ভেঙে দিয়ে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সেই সমস্ত জায়গায় তাঁরা নিজেদের দলের লোক বসান নি ? শিক্ষাবিভাগের সমস্ত ক্ষেত্রে সিপিএম দলীয় নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেনি ? তাদের এই সমস্ত কার্যকলাপ যুক্তফ্রন্টের মধ্যে বিরোধ ডেকে আনেনি ? সিপিএম নেতৃত্বের প্রতি আমার প্রশ্ন — যুক্তফ্রন্ট তাঁরা বানিয়েছেন, তাঁরা বড় দল। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এই পর্যায়ে যুক্তফ্রন্টের ঐক্য রাখা তাঁদের দায়িত্ব। অথচ তাঁরা সরকারের গদিতে বসে ক্ষমতা (power) এমনভাবে প্রয়োগ করতে শুরু করলেন, সুযোগ (privilege) এমনভাবে নিতে আরম্ভ করলেন, যাতে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে বিরোধটা ডেকে আনলেন, ফ্রন্টের মধ্যেকার ঐক্য ভাঙ্গবার জন্য যদি কোন শক্তি কাজ করে থাকে তাকে উস্কানি দিতে সাহায্য করলেন। তাহলে কি তাঁদের রাজনীতিটা ঠিক রইল, আর অন্যেরা যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গার কাজটা করলো? নাকি তাঁদের রাজনীতির জন্যই যুক্তফ্রন্টটা ভাঙলো?

তাঁরা বড় পার্টি। যুক্তফ্রন্টের প্রয়োজনও তাঁদের, তাকে রক্ষার প্রধান দায়িত্বও তাঁদের। সেক্ষেত্রে সিপিএম-এর রাজনীতিটা কী হবে? যখন অন্যান্য পার্টিগুলো যাদের তাঁরা সত্যিকারের বিপ্লবী নয় বলে মনে করেন, সেইসব পার্টি হয়তো নানান প্রশ্ন তুলবে, প্রশাসনকে অপব্যবহার (misuse) করবে, নানারকমভাবে ঐক্যে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করবে, কিন্তু তাঁদের প্রভাবে যখন যুক্তফ্রন্টটা ঐক্যবদ্ধভাবে চলছে, তখন তাঁদের পার্টি কি করবে ? তাঁদের পার্টি তাকে রুখবে। অথচ তাঁরা কি করলেন? বড় দল হয়ে, 'প্রধান বিপ্লবী দল'(!) হয়ে, যুক্তফ্রন্টের ঐক্য রক্ষা করা যা বিপ্লবের স্বার্থেই সবচেয়ে বেশি দরকার, ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের স্তরে পৌঁছাবার জন্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অপর দলগুলোর চরিত্র উদ্‌ঘাটিত (expose) করার জন্য যা দরকার, সেটা তাঁরা করলেন না। ক্ষমতায় বসে আর তাঁদের তর সইলো না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সেই দলগুলোকে কপ্‌ করে গিলে খেতে চাইলেন। আর তারই জন্য পুলিশ-প্রশাসনকে যখন যেখানে যেভাবে পারেন ব্যবহার করতে আরম্ভ করে দিলেন। দেখবেন, বহু জায়গায় পাবলিকের মধ্যে একথা চালু আছে যে, স্থানীয় সি পি এম লিডাররা বা কর্মীরা নিজেরাই একেকজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। থানা, পুলিশ, ডি এম (ম্যাজিস্ট্রেট), এস ডি ও তাঁদের কথায় ওঠে বসে।

কংগ্রেসি আমলে একটা কথা চালু হয়ে গিয়েছিল। কী

সে কথাটা? কথাটা হচ্ছে এই — কংগ্রেসের একজন লোকাল কমিটির মাতব্বর থানায় গিয়ে যেকোন কথা বললে, এস ডি ও'কে যা হয় অনুরোধ করলে তাঁরা সেগুলি ফেলতে পারতেন না। তাঁরা সেগুলি পালন করতেন। কারণ তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে, কংগ্রেসকে আর ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না। এই যে প্রভুকে সেবা করার একটা মানসিকতা, এটা আমাদের ব্রিটিশ আমলের উত্তরাধিকার (legacy), ঔপনিবেশিক শাসনের উত্তরাধিকার। কংগ্রেস সেটাকে বজায় রেখেছে, নিজের স্বার্থে। কেন? না, কংগ্রেস জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। জনগণের উপর কংগ্রেস আস্থা হারিয়েছে। রাজনীতিকে, তত্ত্বকে, রাজনৈতিক আন্দোলনকে হাতিয়ার করে জনতাকে তারা তাদের পিছনে রাখতে পারেনি। প্রশাসন যন্ত্রটাকে কাজে লাগিয়ে কংগ্রেস তার সংগঠনটাকে বিস্তৃত করে রাখতে চেষ্টা করেছিল। যে রাজনৈতিক দল রাজনীতির উপর, গণআন্দোলনের উপর নির্ভর করে, তাদের প্রশাসন যন্ত্র ব্যবহার করার দরকার হয় না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, পরিষদীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কোন বিপ্লবী দলের প্রশাসন যন্ত্র ব্যবহার করা বা তার পৃষ্ঠপোষকতায় সংগঠন বাড়াবার সুযোগ নেওয়ার দরকার হয় না, যদি সেই দল বিপ্লবের তত্ত্বকে নিছক মুখে না বলে এবং জনতাকে পিছনে নেবার জন্য নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে না ফেলে। বিপ্লবী হলে তো সেই দল তা করবে না!

কংগ্রেস যা করে চলেছিল তাতে পুলিশ অফিসাররা এবং আমলারা ধরেই নিয়েছিলেন যে, তাঁদেরও এইভাবেই চলতে হবে। অনেকের হয়তো মনে আছে, যুক্তফ্রন্ট সরকার হবার পর ১৯৬৭ সালের ২৪শে এপ্রিলের মিটিংয়ে আমি বলেছিলাম, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকেও বলেছিলাম, তাঁরা দিল্লির লাড্ডু খাওয়াতে পারবেন কিনা আমি জানি না, কিন্তু একটা কাজ অন্তত তাঁরা যদি করতে পারেন, তাহলে মস্ত কাজ হবে। তা হচ্ছে এই যে, যদি তাঁরা ঠিকভাবে চলেন, প্রশাসন আর পুলিশের লোকগুলো অন্তত বুঝবে যে, কর্তার সেবা করে নিজেদের আখের গোছানোর নীতিটা এখন থেকে তাঁদের ছাড়তে হবে। এ ঔপনিবেশিক মানসিকতা, ব্রিটিশদের কাছ থেকে যে মানসিকতা তাঁরা উত্তরাধিকার হিসাবে অর্জন করেছেন, সেইটি তাঁদের ছাড়তে হবে। যুক্তফ্রন্ট আসার সময় প্রথম প্রথম পুলিশ-প্রশাসন ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় বসার সঙ্গে সঙ্গেই বৃহৎ পার্টির মনোভাব দেখেই তারা বুঝে নিল, এও কংগ্রেসের মতোই। তারা নিশ্চিন্ত মনে আগের লাইনেই চলল। বরং একটা বাড়তি সুবিধা তাদের হল। কংগ্রেসকে তোষামোদ করতে গেলে লোকে তাদের গালাগালি দিত, এখন সিপিএমকে তোষামোদ করলে 'প্রগতিশীল পুলিশ', 'জনগণের সেবক' হওয়া যায়। যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় বসার সঙ্গে সঙ্গেই, আর মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্তৃত্ব সরকারের উপর প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি পুলিশের শ্রেণীচরিত্রটাই পাল্টে গেল! পুলিশ নাকি তারা ক্ষমতায় আসার পর 'জনতার সেবার যন্ত্রে' রূপান্তরিত হয়ে গেছে ! এমন মার্ক্সবাদ কোথা থেকে এল, কোন্ মার্ক্সবাদী তত্ত্বে এমন কথা আছে, আমি জানিনা। সিপিএম পুলিশদপ্তর হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশের শ্রেণীচরিত্র কী করে পাল্টে গেল? তাহলে কাল যদি ভোটে জিতে তারা কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে, তখন মিলিটারি আর ব্যুরোক্র্যাসির চরিত্র পাল্টে গিয়ে জনগণের সেবকে পরিণত হবে ? তবে আর বিপ্লবের দরকার কী? তা হলে 'বিপ্লব' 'বিপ্লব' বলে মানুষকে ঠকাচ্ছেন কেন, আর কর্মীদেরই বা উত্তেজিত করছেন কেন? তাহলে আসল কথাটা থলি থেকে বের করেই ফেলুন না। আসল কথাটা হচ্ছে, পশ্চিমবাংলার হাওয়া, জনগণের মানসিকতা — এসব চোখের সামনে রেখে, তাঁদের কর্মীদের উত্তেজিত করার জন্যই এতো 'বিপ্লব' 'বিপ্লব' বলা হচ্ছে, দল বাড়াবার জন্য বলা হচ্ছে। বিপ্লব তাঁরা চাননা, চাইলে পুলিশ-প্রশাসনকে ব্যবহার করে অপরের সংগঠন তাঁরা ভাঙতেন না। আমরা 'বিপ্লব' বলি, কারণ আমরা যথার্থই বিপ্লব চাই। তাই বলছিলাম, মার্ক্সবাদী দল, বিপ্লবী দল, যুক্তফ্রন্টের প্রধান হিসাবে বিপ্লবী দল যদি ক্ষমতায় যায়, তাহলে তাদের কাজ হল — অপরে যদি প্রশাসনকে অপব্যবহার করে, তবে তা করতে না দেওয়া। এবং তারই ভিত্তিতে, প্রশাসনকে পক্ষপাতমুক্ত (neutral) রেখে এই এতগুলো পার্টির সম্মিলিত ফ্রন্টটা যেন না ভাঙ্গে তার কার্যকরী রাজনীতিটা দেওয়া।

তাহলে সিপিএমকে কোন্ জিনিষটা বুঝতে হবে? বুঝতে হবে, পাঁচটা পার্টি একত্রে যখন ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আসে, তখন তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের আদর্শ-রাজনীতি নিয়েই আসে। প্রত্যেকেরই অপর

প্রত্যেকের সঙ্গে রাজনীতিগত কিছু কিছু পার্থক্য আছে, আর প্রত্যেকেরই জনগণের উপর কিছু কিছু প্রভাব আছে। তাই প্রত্যেকেই সেই প্রভাব বৃদ্ধির জন্য নিজ নিজ শক্তিতে এগোবার চেষ্টা করবে, ফলে পরস্পর আদর্শগত সংগ্রাম আসবেই। তাহলে, পরস্পর আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে, যুক্তফ্রন্টের ঐক্যের স্বার্থে লাঠালাঠিকে এড়াতে হবে। কোথাও যদি কখনও কখনও দু'চারটে লাঠালাঠির ঘটনা ঘটেই যায়, তবুও পরস্পর আদর্শগত সংগ্রাম চালাবার সাথে সাথে যুক্তফ্রন্টের সবাই মিলে মূল শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে যে প্রোগ্রামের ভিত্তিতে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি, প্রশাসনকে নিরপেক্ষ (neutral) রেখে সেইসব প্রোগ্রাম কার্যকরী করার জন্য গণআন্দোলনগুলোকে চালিয়ে যেতে হবে। ফলে, একই সঙ্গে যুক্তফ্রন্টের ঐক্যকে বজায় রাখা, অন্যদিকে দলবৃদ্ধির জন্য আদর্শগত সংগ্রামের রাস্তায় দলগত রাজনীতির সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া — এই দুটি কাজ একই সঙ্গে করা দরকার।

সিপিএম এর একটা করতে গিয়ে আরেকটা নষ্ট করলেন। দলগত রাজনীতির প্রভাব বিস্তার করতে গিয়ে তাঁরা ঐক্য ভাঙ্গবার রাজনীতিতে পা দিলেন। ঐক্য রক্ষা করবার মতো এমন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নটিকে পর্যন্ত তাঁরা তোয়াক্কা করলেন না, প্রশাসনকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করতে চাইলেন। আর লোককে ভুল বোঝাবার জন্য যা যা বলা দরকার, সমানে সেইসব চমক (stunt)দিয়ে যেতে লাগলেন। এতে কি ফ্রন্ট থাকে? যেমন কাগজে দেখলাম, জ্যোতিবাবু বলেছেন যে, সিপিএম নিজের দলীয় প্রভাব বৃদ্ধির স্বার্থে পুলিশকে, স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে ব্যবহার করেছে, এমন একটা উদাহরণও, একটা ঘটনার সত্যতাও কেউ দেখাতে পারবেন না। তিনি বলেছেন, একটা দলও নাকি এ বিষয়ে কোনও দিন কোনও উদাহরণ দেয়নি, কোনও ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করতে পারেনি, শুধু সিপিএম-এর বিরুদ্ধে ফাঁকা গালাগালি দিয়ে গেছে।

জ্যোতিবাবুর এ কথাটা সত্য কথা নয়। আমি নিজে জানি, আমাদের দলের রেকর্ড থেকে ঘটনা তুলে তুলে আমি বলতে পারি। আমি কটু কথা বলতে চাইনে, বলা উচিতও নয়। ক্যানিং থানার ভলেয়া গ্রামের ঘটনাটা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি দিয়ে আমরা জানিয়েছি। তারপর কুলপির ঘটনা, এই সেদিন আগুনে পুড়িয়ে মারার ঘটনা যা কাগজে পড়লেন, সেটা তাঁকে ব্যক্তিগত চিঠি দিয়ে জানিয়েছি। তারপর কুলতলীর ঘটনা — সামনে দুশো সশস্ত্র পুলিশকে শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে (মহাভারতে শিখন্ডীর গল্প পড়েছেন। অর্জুন সামনে শিখন্ডী খাড়া রেখে ভীষ্মের মত বীরকে মেরে ফেলেছিল) আমাদের সাত হাজার কৃষক সমাবেশের উপর পাঁচশো সি পি এম-এর লোক আক্রমণ করে আমাদের অতগুলো লোককে খুন-জখম করে বেরিয়ে গেল। এ সমস্ত ঘটনাগুলি ব্যক্তিগতভাবে চিঠি দিয়ে তাঁকে জানিয়েছি। আমরা জ্যোতিবাবুকে বলেছি, তিনি সমস্ত ঘটনার তদন্ত করুন। মন্ত্রী পর্যায়েও এ-ঘটনা তোলা হয়েছে এবং আলোচনাও করা হয়েছে। অথচ এ সব কথা চেপে গিয়ে কাগজওয়ালাদের জ্যোতিবাবু বেমালুম বলে দিলেন, একটা উদাহরণও, একটা ঘটনার সত্যতাও কেউ দেখাতে পারেননি। অথচ স্বাভাবিক ন্যায়বিচার (natural justice) কী বলে? স্বাভাবিক ন্যায়বিচার বলে, যদি কারোর সম্বন্ধে আমি অভিযোগ করি, তাহলে যার কাছে আমি অভিযোগ করলাম, তিনি কেবল যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তার কাছেই ঘটনা জানতে চাইবেন না, বা তার রিপোর্টটি নিয়েই শুধু ক্ষান্ত থাকবেন না, বা তার রিপোর্ট অনুযায়ীই মনে করবেন না যে, সে যা বলছে ঘটনাটি সেরকমই। তিনি সত্য ঘটনা জানার জন্য সমস্ত পক্ষ থেকে, সমস্ত দিক থেকে খবর নেবেন। তা না করে জ্যোতিবাবু কী করলেন ? তাঁদের নিজেদের পার্টি আর পুলিশের বিরুদ্ধেই, অর্থাৎ স্থানীয় পুলিশ অথরিটি এবং জেলা পুলিশ অথরিটির বিরুদ্ধেই যেখানে অভিযোগ, সেখানে উনি সত্য ঘটনা জানবার জন্য সেই পুলিশ কর্তৃপক্ষেরই রিপোর্ট চাইলেন, আর নিজের পার্টির রিপোর্ট চাইলেন। দেখা গেল, তাদের পার্টি যা রিপোর্ট দিচ্ছে, পুলিশের রিপোর্টেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই কথা বলা হয়েছে। হুবহু মিল সিপিএম পার্টির রিপোর্টে, আর পুলিশের রিপোর্টে। আর সেই রিপোর্ট দেখেই উনি বললেন, এই তো রিপোর্টে উল্টো কথা আসছে। কিন্তু এটা কি স্বাভাবিক ন্যায়বিচার যে, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তার কাছ থেকেই রিপোর্ট নেবেন এবং তাকেই সত্য বলে মেনে নেবেন? তাদের পার্টির কোনও জেলা অথরিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ, আর তারই রিপোর্ট তিনি অভ্রান্ত সত্য বলে ধরে নিলেন। আমাদের পার্টির কোনও জেলা অথরিটির বিরুদ্ধে যদি সিপিএম অভিযোগ করে, সেই ব্যাপারটা জানবার জন্য আমি আমার দলের জেলা অথরিটিকে জিজ্ঞাসা করতে

পারি। কিন্তু যদি এমন হয় যে, আমাদের দলের জেলা অথরিটি যা রিপোর্ট দিল, সেইটা হুবহু পড়ে গিয়ে আমি বলি, সিপিএম যা বলেছে তা সত্য নয়, কারণ এই হলো ঘটনা। তাহলে কি আমার কাছে তাঁরা স্বাভাবিক ন্যায়বিচার পাবেন? তা কি তাঁরা আশা করতে পারেন? জ্যোতিবাবু কিন্তু তাই করেন। যে পুলিশের দেওয়া রিপোর্টকে মানুষ ঘৃণা করত, উনি হয় কথায় নয় কথায় সেই পুলিশের রিপোর্টকেই সত্যের মর্যাদা দিতে শুরু করলেন।

এইভাবে পুলিশ রিপোর্টের ইজ্জত বাড়িয়ে দিয়ে গেলেন জ্যোতিবাবু। আমাদের দেশে সেই বৃটিশ আমল থেকে পুলিশ কীভাবে রিপোর্ট দেয় জানা নেই তাঁদের? পুলিশ কীভাবে কেস তৈরি করে জ্যোতিবাবু জানেন না? তাঁরা নিজেরা তার ভুক্তভোগী নন? সেই পুলিশ কি রাতারাতি পাল্টে গেল? আর সবচেয়ে বড় কথা, সেই পুলিশের বিরুদ্ধেই তো আমাদের অভিযোগ। তাঁদের পার্টির সঙ্গে পুলিশের যোগসাজস সম্বন্ধেই তো আমাদের অভিযোগ। আর জ্যোতিবাবু তাঁদের পার্টির আর পুলিশের রিপোর্টের উপরেই আমাদের অভিযোগ খণ্ডন করলেন। খণ্ডন করতে গেলে, তাঁদের নিজেদের আমাদের কাউকে নিয়ে গিয়ে নিরপেক্ষভাবে এবং স্থানীয়ভাবে তদন্ত করে তবে খণ্ডন করতে হত। এ রকম একটাও তদন্ত তিনি করেছেন? তাঁকে ঘটনা জানানো হয়েছে, ভলেয়া, কুলতলি, কুলপী এবং আরও অনেক ঘটনা। আরও ছোটখাট ঘটনাও তাঁকে জানানো হয়েছে। অন্যেরা কে কি দিয়েছেন জানি না, কিন্তু আমরা তো দিয়েছি! কিন্তু কোথাও তিনি গিয়ে নিরপেক্ষভাবে সত্য জেনে আসবার চেষ্টা করেছেন? সেটা তো করেনইনি, উপরন্তু যে পুলিশ এবং তাদের দলের বিরুদ্ধেই আমাদের চার্জ, সেই পুলিশ এবং তাদের দলের রিপোর্ট পড়েই তিনি আমাদের অভিযোগগুলি চাপা দিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, অনেক রিপোর্টের, অনেক অভিযোগের, অনেক আবেদনের চিঠির উত্তর দেবার মতো ভদ্রতাটুকু পর্যন্ত তিনি প্রকাশ করেননি। এর উপর আবার খবরের কাগজওয়ালাদের কাছে বলে দিচ্ছেন, একটাও ঘটনার উদাহরণ অন্যরা দেয়নি। এ কি রাজনীতি? এতো গোয়েবল্‌স্‌কেও ছাড়িয়ে গেছেন তাঁরা! মুখে এমন সব কথা বলেন যার সঙ্গে সত্যের কোন সম্পর্ক নেই।

এ সব ঠিক নয়। ঐক্য রাখতে গেলে একটা সংযুক্ত ফ্রন্টে, এরকম স্টান্টের রাজনীতি পরিত্যাগ করতে হবে। না হলে ঐক্য থাকে না। তাঁরা মতবাদিক সংঘর্ষ করুন, আদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অপরের রাজনীতিকে পরাস্ত করুন। আমরা যেমন বলছি, তাঁদের মারের বিরুদ্ধে আমরা পারি মারবো, না পারি মার খাবো। কিন্তু আমরা রাজনৈতিক মতাদর্শগত প্রচারের রাস্তায় লড়বো। তাদের কর্মীরা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের ওপর হামলা করেছে, তার জন্য তো আমরা যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে যাইনি! যুক্তফ্রন্ট আমলে আমাদের উনিশজন কমরেড সিপিএম-এর হাতে মারা গিয়েছে। সেজন্য আমরা কি বেরিয়ে গিয়েছি? আমরা আজও যুক্তফ্রন্টকে রাখতে চাই। সিপিএম-কে নিয়েই রাখতে চাই, এবং তার জন্য বাংলা কংগ্রেসের উপর বর্তমানে চাপ দেওয়ারও চেষ্টা করছি। বাংলা কংগ্রেস যদি না আসে, তাহলে আলাদা কথা। কিন্তু তাঁরা সাড়া দিন, বলুন তাঁরা তাঁদের রাজনীতি পাল্টাবেন, সংশোধন করবেন। সি পি এমের কর্মীদের কাছে আমার অনুরোধ, এই ঐক্য বিনষ্টকারী রাজনীতি, যেটা তাঁদের নেতারা তাঁদের এনে দিয়েছেন, সেটা পরিত্যাগ করুন। তাঁরা হয় এই নেতৃত্বকে সংশোধন করুন, নয় অপসারিত করুন। সিপিএম নেতৃত্বকে আবার আমরা জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা খোলাখুলি বলুন, যুক্তফ্রন্ট আপনারা চান কিনা? আপনারা ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন কিনা? কিন্তু উল্টোপাল্টা চূড়ান্ত অসত্য কথা বলবেন না। যাহোক বলে জনতাকে বিভ্রান্ত করবেন না। যুক্তফ্রন্ট বা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন যদি আপনারা না চান ভালো, আপনারা একা লড়ুন। সিপিএম-এর নেতারা তো বলেন, গণআন্দোলনের শক্তি তো নাকি সবই তাঁদের পিছনে। তাহলে আমাদের দলের ডাকে আজকের এই বৃহৎ জনসমাবেশে এখানে যাঁদের দেখছেন, বা আরও যে সমস্ত দল এখানে ওখানে মিটিং করে সেই সমস্ত মিটিং-এ যে সমস্ত মানুষ থাকেন তাঁরা কি সব শঙ্করাচার্যের মায়া ? তাঁরা নেই ? যেমন জগৎ মিথ্যা, শঙ্করাচার্যের মায়া, তেমনি আমরাও সব মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে দেখছি এই যে মিটিং-এর বিশাল জনতা, বা বিভিন্ন জায়গায় আমাদের যা শক্তি বলে আমরা বলছি সেগুলি সবই মায়া, মায়ায় আচ্ছন্ন ? আমরা সব জোতদারের মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে এগুলো দেখছি, বাস্তবে এগুলোর অস্তিত্ব নেই ? তাই যদি তাঁরা মনে করেন, ভালো কথা! তাঁরা একা লড়ুন।

আবার সাথে সাথে তাঁরা বলছেন, জোট বাঁধার দরকার আছে। আর জোটটি কি করে বাঁধবেন? না, তাঁদের মতে শ্রেণীভিত্তিক জোট হবে। তাঁদের এই শ্রেণীভিত্তিক কথাটার মানে আসলে কি? না, বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেসের সুকুমার রায়ের* মতো লোক বা এভাবে আর পাঁচটা লোক খাড়া করে পাঁচটা পার্টির লেবেল তার ওপর এঁটে দিয়ে তারপরে একটা জোটের নাম দিয়ে বলবেন, শ্রেণীসংগ্রামের আলোকে এবং মাপকাঠিতে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে, 'ইহারাই বিপ্লবী আন্দোলনের সহযোদ্ধা' এবং এই সমস্ত পার্টিগুলোর সম্মিলিত ফ্রন্টই হলো 'গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' ! আমি বলি, এইভাবে তাঁদের লোকঠকানোর দরকারটা কী? তাঁরা সরাসরি লড়ুন! তাঁরা বলুন, একদিকে একা তাঁরা, আর একদিকে পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রন্ট — দেখা যাক, বাংলার মানুষ কোন্ দিকে রায় দেয় ? তাহলে বুঝব, তাঁদের বুকের পাটা আছে। তা না করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছেন কেন, উল্টোপাল্টা বলে বিভ্রান্ত করছেন কেন? সোজাসুজি তাঁরা বলুন যাতে তাঁদের বোঝা যায়, তাঁদের রাজনীতিটা বোঝা যায়। তাঁদের রাজনীতি কেউ মানতে পারেন, কেউ না মানতেও পারেন — কিন্তু এমন করে বলুন যাতে সেটা বোঝা যায়, যাতে সকলেই বুঝতে পারেন। আমরা বুঝতে পারি, জনসাধারণ বুঝতে পারে, তাঁদের পার্টির কর্মীরাও বুঝতে পারে। এতে তাঁদের ভয় কিসের ? তাঁদের রাজনীতি ভুল প্রমাণিত হলে, যদি তাঁদের দলের কর্মীরা অন্ধ না হয় তাহলে তাঁরাই তাঁদের সংশোধিত করে আবার ঠিক রাস্তায় নিয়ে আসতে পারবেন। কিন্তু তা তাঁরা করছেন না। উল্টে যা তাঁরা করছেন তা বলছেন না, আর যা বলছেন তা করছেন না। তা আমার কথা, এইভাবে শুধু স্ববিরোধী কতগুলো উল্টোপাল্টা কথা বলে বিভ্রান্ত করছেন কেন? তাই তাঁদের কাছে আমাদের বক্তব্য, যুক্তফ্রন্টের ঐক্য বিনষ্টকারী, গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের ঐক্য বিনষ্টকারী রাজনীতি তাঁরা ত্যাগ করুন। সাথে সথে বাংলা কংগ্রেস নেতাদের বলব, তাঁরাও তাঁদের একগুঁয়েমি ছাড়ুন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে চাই। দেখুন মার আমরা ছোট দল হিসাবে সিপিএমের তুলনায় অনেক বেশি খেয়েছি। ওদের তুলনায় আমরা অনেক ছোট, কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি (casualty) নিতে হয়েছে আমাদের অনেক বেশি। ২০ বছরের কংগ্রেসি আমলের তুলনায় এই যুক্তফ্রন্টের কয়দিনের রাজত্বে আমাদের কম ক্ষতি নিতে হয়নি। চাষী আন্দোলনের ক্ষেত্রে সমগ্র সুন্দরবন এলাকায়, বীরভূম এবং অন্যান্য জেলাতেও, আপনারা জানেন, গরিবের পার্টি, গরিব চাষীর পার্টি বলে আমাদের এস ইউ সি আই পার্টিটার সুনাম আছে। সমগ্র ২৪ পরগণায় গরিবের সংগঠন হিসাবে আমাদের চাষী সংগঠন ক্ষেতমজুর ফেডারেশনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্রভাব। মধ্যবিত্তরা পর্যন্ত আমাদের দলের বিরুদ্ধতা করে এই কারণে যে, আমরা লড়েছি গরিব চাষী আর ক্ষেতমজুরের হয়ে। হুমায়ুন কবীরের মতো একজন প্রতিক্রিয়াশীল, সিদ্ধার্থ রায়ের মতো একজন কংগ্রেসী, ২৪ পরগণার জোতদারশ্রেণী ও কংগ্রেস নেতারা সকলে একবাক্যে বলেছে, ২৪ পরগণার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে গরিব চাষী-ক্ষেতমজুরদের হয়ে লড়াই করে আমরা জোতদারদের জীবন, ধনমান সব বিপন্ন করেছি। তা আমরা করেছি কিনা সেটা আলাদা কথা। কিন্তু কথা হচ্ছে, আমরা লড়াই করেছি বলেই এসব কথা উঠছে। বলা হয়েছে, সেখানে গরিব চাষীর রাজত্ব কায়েম হয়েছে, আমরা নাকি নিজেদের রাজত্ব সেখানে কায়েম করেছি। এই সেদিনও বলেছে, সেখানে গরিব চাষীরা আমাদের নেতৃত্বে সংগঠিত। গ্রামীন জোতদার ও ধনী চাষীর বিরুদ্ধে গরিব মানুষের হয়ে এই লড়াই সত্ত্বেও আমাদের সংগঠিত চাষী এলাকাগুলোতে পুলিশ-প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে সিপিএম যে পরিকল্পিত হামলা চালিয়েছে এবং তার ফলে আমাদের যে বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সে সম্পর্কে সিপিএম নেতারা বলছেন, এটা নাকি তাঁদের শ্রেণীসংগ্রাম।

আর বর্ধমান জেলায়, যেখানে সি পি এমের সবচেয়ে বড় সংগঠন বলে তাদের পার্টি দাবি করে, যে বর্ধমান জেলা পশ্চিমবাংলার জোতদারদের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি, বড় বড় বাঘাবাঘা জোতদারদের ঘাঁটি, সেই বর্ধমান জেলায় শ্রেণীসংগ্রামের কী কাহিনী সিপিএম নেতারা তুলে ধরতে পারেন! টুকরোটাকরা দু-একটা বিচ্ছিন্ন লড়াইয়ের ঘটনা ছাড়া সেখানে যথার্থ অর্থে কী কোন শ্রেণীসংগ্রাম হয়েছে? জোতদাররা কি সেখানে নেই? তাহলে সেখানে কি জোতদারদের সঙ্গে তাঁদের সহঅবস্থান হচ্ছে? নাকি

---

* বাংলা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে যিনি বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস খাড়া করে সিপিএমকেই সমর্থন করেছেন।

সেখানকার পুরো জোতদার গোষ্ঠীই বিপ্লবের সহযোদ্ধা হয়ে একেবারে তাদের দলের লোক হয়ে গিয়েছে? কোন্‌টা? অথচ তাঁরা শ্রেণীসংগ্রামটা শুরু করলেন ২৪ পরগণায়, যেখানে ক্ষেতমজুররা ইতিমধ্যেই আমাদের দলের অধীনে সংগঠিত! এর অর্থ বুঝতে তো অসুবিধা নেই! এর অর্থ, যে জোতদাররা কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল, কমিউনিস্ট বিদ্বেষ থেকে প্রথমে তারা গেল বাংলা কংগ্রেসের দিকে। যখন দেখল বাংলা কংগ্রেস তাদের রক্ষা করতে পারেনা, তারা তখন গেল সিপিএমের দিকে। আর সেই জোতদারদের কেন্দ্র করে যে মুষ্টিমেয় নগণ্য গরিবরা তখনও অসংগঠিত ছিল — কারণ একটা এলাকায় বড় সংগঠন মানে পাঁচটা-দশটা গরিব চাষী জোতদারদের প্রভাবে নেই এমন তো নয় — তাদেরকে নিয়েই চাষীরা যেসব বেনাম জমি দখল করেছিল, সেইগুলো পুনর্দখলের লড়াইকেই তাঁরা 'জোতদারদের বিরুদ্ধে লড়াই' বলে চালাতে আরম্ভ করলেন। তাই আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ, ওটাকে প্রমোদবাবুরা শ্রেণীসংগ্রাম বলতে পারেন। কারণ চাষীর সঙ্গে জোতদারদের লড়াইটা চাষীর পক্ষে যেমন শ্রেণীসংগ্রাম, তেমনি জোতদারদের চাষীর বিরুদ্ধে যে লড়াই সেটাও জোতদারদের তরফে শ্রেণীসংগ্রাম। প্রমোদবাবুরা সেই শ্রেণীসংগ্রামই করছেন। জোতদারদের সঙ্গে নিয়ে যখন তাঁরা চাষীর বিরুদ্ধে লড়ছেন, তখন তা শ্রেণীসংগ্রাম বৈকি ! ঠিকই করছেন। তা তাঁরা দক্ষিণ ২৪ পরগণায় যে শ্রেণীসংগ্রামটা করলেন — সেখানে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে তাদের যে শ্রেণীসংগ্রামের আন্দোলন, তার কেন্দ্রস্থল হলো সেই জায়গা, যেখানে আমাদের সংগঠন। আর যেখানে বর্ধমান জেলায় তাঁদের নিজস্ব সংগঠন, সেইখানে ছোটখাটো দু-চারটে বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া শ্রেণীসংগ্রামের বন্যা আমরা দেখতে পাই নি। তাহলে এগুলির নাম শ্রেণীসংগ্রাম, নাকি এগুলির নাম অপরের সংগঠন ভাঙা ? এই সুবোধবাবু এখানে বসে আছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন। একটার পর একটা গ্রাম পুলিশকে সামনে রেখে, আমাদের কমরেডদের গ্রেপ্তার করিয়ে জোতদার আর গুণ্ডাদের আমাদের গরিব চাষী-ক্ষেতমজুরদের বিরুদ্ধে সিপিএম সংগঠিত করেছে, হামলা করেছে। কখনও আমাদের চাষীদের ওপর সরাসরি পুলিশি আক্রমণ হয়েছে। এই সুবোধবাবুই একদিন রেগে গিয়ে জ্যোতিবাবুকে বলেছিলেন, আমরা ছোট দল। ভাঙ্গতে চান, মেরে আমাদের পশ্চিমবাংলার মাটিতে মিশিয়ে দিতে চান তো আসুন। শুধু পুলিশকে পাঠাবেন না — এই কথাটা ঘোষণা করুন। ঘোষণা করুন যে, কংগ্রেসি আমলের মতো স্থানীয় ক্ষেত্রে আপনাদের পার্টির কর্মকর্তারা পুলিশের কর্মকর্তা হবে না।

সবশেষে, প্রশাসনে যাঁরা আছেন, তাঁদের কাছে কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমি তাঁদের বলতে চাই যে, আপনারা ভুল করছেন। আপনারা যদি ভেবে থাকেন, সেই ঔপনিবেশিক রাজনীতির ধরনেই যেমন করে কংগ্রেসকে সেবা করে এসেছেন, সেই একইভাবে সিপিএমকে সেবা করে আরও মজায় থাকবেন, তাহলে জনগণ আপনাদের ক্ষমা করবে না। জনসাধারণ চায় গণতান্ত্রিক প্রশাসনে জনগণের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, দেশপ্রেমিক মনোভাব নিয়ে (pro-people, patriotic attitude) আপনারা পক্ষপাতহীনভাবে আচরণ করুন, কোনও রাজনৈতিক দলের দালালি করবেন না। এ যদি আপনারা না করেন, তাহলে আজ হোক কাল হোক, জনগণের রোষ আপনাদের উপরে নেমে আসবেই। তখন জনতার কাছ থেকে আজ আপনারা যে ঘৃণা কুড়োচ্ছেন, তা থেকে কেউ আপনাদের রক্ষা করতে পারবে না। সি পি এমের কয়েকটি কর্মীর প্রচারেও তা দূর হবে না, যেমন আজও হয়নি। বাংলার জনসাধারণ পুলিশকে কোনওদিনই, সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের আমল থেকে আজ পর্যন্ত কোনওদিনই শ্রদ্ধার চোখে দেখেনি। অথচ এই রোষ আপনারা এড়াতে পারতেন, যদি শাসকদলের রাজনীতির তাঁবেদারি না করে প্রশাসনে ন্যায়নিষ্ঠ পক্ষপাতশূন্য আচরণ (administration-এ impartially behave) করতেন, নিরপেক্ষ আচরণ (neutrally behave) করতেন, যদি এই ভুল না করতেন। আর সি পি এমও চিরকাল ক্ষমতায় থাকবে না। সরকারি ক্ষমতায় সিপিএম কোনও দিন একা লড়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে না।

এ স্বপ্ন যদি সিপিএম নেতারা দেখে থাকেন তো ভুল। অমি তো বলছি, তাঁরা একথা ঘোষণা করুন যে, তাঁরা জনশক্তির নেতা, তাঁরা একাই এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করবেন। না, সে বেলা একটা ঐক্যজোট (alignment) তাঁদের করতে হবে। করতেই হবে। সেই ঐক্যজোটটা কাদের নিয়ে হবে? না, ওয়ার্কার্স পার্টি, মার্ক্সিস্ট ফরোয়ার্ড ব্লক, আর সি পি'র সুধীন কুমার

গ্রুপ — অর্থাৎ অনেকগুলো আর সি পি আছে তো তাদের একটা, এ তো আছেই। আর তার সাথে সুকুমার রায়, যিনি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে বাংলা কংগ্রেসে গেলেন, তারপরে আবার বাংলা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গেলেন তাঁকে দিয়ে আবার একটা বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস খাড়া করতে হবে। তারপর যে পার্টিগুলোর নাম আমি বললাম তাদের, আর বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেসকে নিয়ে একটা জোট খাড়া করে দেখাতে হবে, এই দেখ শ্রেণীভিত্তিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফ্রন্ট গঠন করে তাঁরা লড়ছেন। আমি বলি, বেশ, তাই যদি তাঁদের ইচ্ছা হয় তাহলে লড়বেন, বাংলার জনসাধারণকে মোকাবিলা করবেন, দেখা যাবে। বাংলার মানুষ যদি তাঁদের গ্রহণ করে, মাথা পেতে মেনে নেব।

কিন্তু আমি বলি, এ রাস্তায় পা দেবেন না। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐক্য বিনষ্টকারী রাস্তায় পা দিয়ে আপনারা বেইজ্জত হবেন, এটাও আমাদের কাম্য নয়। আমরা চাই, তাঁরা তাঁদের ভুল রাজনীতির পথ ত্যাগ করে আবার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল স্রোতের সঙ্গে মিলিত হোন। আমরা তাঁদের কতটা পর্যুদস্ত করলাম, তাঁরা আমাদের কতটা পর্যুদস্ত করলেন, এ রাজনীতিতে অন্যের উৎসাহ থাকতে পারে, আমরা পছন্দ করি না। আমাদের দল আজও চায়, যুক্তফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তা যেখানে নিঃশেষিত হয়ে যায়নি, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্তর যেখানে আজও রয়েছে, তাই ইলেকশনের রাজনীতিতে তাঁদেরও যেতে হচ্ছে, আমাদেরও যেতে হচ্ছে, সেখানে বাস্তবকে স্বীকার করুন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রয়োজনে, নিজেদের মিথ্যা প্রেস্টিজ ইস্যু খাড়া না করে, আর এই যে মারাত্মক ঐক্যবিরোধী রাজনীতি, যা তাঁদের দলের মূল রাজনৈতিক প্রস্তাবের সঙ্গেই অসঙ্গতিপূর্ণ (inconsistent) তা পরিত্যাগ করে যুক্তফ্রন্টকে পুনরুজ্জীবিত করতে সাহায্য করুন। এ ব্যাপারে আমাদের প্রচেষ্টায় তাঁরা সাহায্য করুন। তারপরেও যদি বাংলা কংগ্রেস গোঁ ধরে যে, সিপিএমকে যুক্তফ্রন্টে নিলে তারা থাকবে না, তখন বাংলা কংগ্রেসকে বাদ দিয়েই বাকি আমরা যারা আছি তারা সবাই মিলে পশ্চিমবাংলার গণআন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করব। কিন্তু এখন বাংলা কংগ্রেসকে নিয়েই চেষ্টা করতে হবে। প্রথম থেকেই বাংলা কংগ্রেসকে যদি যুক্তফ্রন্টে না নেওয়া হত, যে কথা আমরা বলেছিলাম, তাহলে আলাদা কথা ছিল। কিন্তু বাংলা কংগ্রেসকে গণতান্ত্রিক শক্তি হিসাবে যুক্তফ্রন্টে সিপিএম নেতারাই এনেছেন, কোনও নীতিগত কারণে বাংলা কংগ্রেস যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে যায়নি।

তাহলে, আসল কথাটা আগে আলোচনা করুন। আমি মনে করি, আমাদের দল মনে করে, পশ্চিমবাংলায় এখনো যুক্তফ্রন্টকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়। তার জন্য সমস্ত প্রকার প্রচেষ্টা চালানো দরকার। এটা করতে হলে সিপিএমকে তার গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের ঐক্য বিনষ্টকারী রাজনীতি আগে পরিত্যাগ করতে হবে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সহযোদ্ধা, যুক্তফ্রন্টের মিত্র শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা রটনার রাজনীতি বর্জন করতে হবে। সহযোগী দলগুলির বিরুদ্ধে নানারকমভাবে তাদের দলের কর্মীদের উত্তেজিত করে তারা যে ভিতরের আবহাওয়া বিষাক্ত করে তুলেছিল — এই রাজনীতি তাদের পরিত্যাগ করতে হবে। গণমতের একটা প্রচণ্ড ঢেউ তুলে সিপিএমকে বাধ্য করানো দরকার সেই পথে যেতে। তা না হলে যে ঝঞ্ঝাট নেমে আসবে, যে ক্ষয়ক্ষতি গণআন্দোলনের হবে, তার দ্বারা দেশের আপামর শোষিত সাধারণ মানুষেরই চরম ক্ষতি বর্তাবে। এইটুকু বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ।

দলের নেতৃস্থানীয় সংগঠক ও কর্মীদের প্রতি

নীহার মুখার্জী

আগামী ৫ আগস্ট আমাদের প্রিয় নেতা, এ যুগের অন্যতম বিশিষ্ট মার্কসবাদী দার্শনিক ও চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের ২৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হতে চলেছে। বর্তমান আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির বিচারে এবারের ৫ আগস্ট বহু দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শক্তিগুলো হানাদারী যুদ্ধ, দখলদারী রাজ ও বিশ্বায়নের বোঝা চাপিয়ে দিলেও বিশ্বজুড়ে এবং পুঁজিবাদী ভারতেও অবস্থা ধীরে ধীরে পাল্টাচ্ছে। মার্কিনী যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে সারা দুনিয়া জুড়ে ধিক্কার, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ এবং ইরাকের জনগণের বীরত্বপূর্ণ লড়াই ইরাকে মার্কিন প্রশাসনকে পিছু হটতে বাধ্য করেছে। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশে দেশে সমাবেশ-মিছিল-বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে ফেটে পড়ছে জনগণের এই যে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ, এরই মধ্যে নিহিত আছে বর্তমান পরিস্থিতির বৈপ্লবিক তাৎপর্য। ভারতেও গত সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন বিজেপি জোট সরকারের পরাজয় নিঃসন্দেহে বিজেপি'র সাম্রাজ্যবাদঘেঁষা নীতি, লাগামছাড়া বিশ্বায়ন-বেসরকারীকরণ - উদারীকরণের বিরুদ্ধে জনতার পুঞ্জীভূত বিক্ষোভেরই প্রকাশ। দরকার আজ শুধু উপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন যথার্থ বিপ্লবী মার্কসবাদী পার্টির, যে এই পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করার দ্বারা জনসাধারণকে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবে এবং বিপ্লবের লক্ষ্যে পরিচালিত করবে।

কমরেড শিবদাস ঘোষ ভারতের বুকে একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে আমাদের দল এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠাতা, শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক। ১৯৪৮ সালের ২৪ এপ্রিল তাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে আমাদের দল পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লাইন অনুসারে এদেশের বিভিন্ন অংশের শোষিত মানুষের অগণিত শ্রেণীসংগ্রাম ও গণসংগ্রাম সংঘটিত করে এসেছে। এরই ফলশ্রুতিতে আজ ভারতের ২০টি প্রদেশে আমাদের দল কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে ছড়িয়ে দিতে ও সংগঠন গড়ে তুলতে পেরেছে এবং সাধ্যশক্তি মতো আন্দোলন গড়ে তুলছে। এর মধ্যে কেরল, কর্ণাটক, হরিয়ানা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, আসাম, ওড়িশা, পশ্চিমবাংলার মতো রাজ্যগুলোতে দল উল্লেখযোগ্য শক্তি অর্জন করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে মেকী বামপন্থী সি পি এম চালিত ফ্রন্ট সরকারের গত ২৭ বছরের একটানা শাসনকালে সি পি এম-এর নির্লজ্জ মালিকতোষণ নীতি, পুলিশি মদতে গণআন্দোলন দমন, চরম সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও দলবাজির নিকৃষ্ট রাজনীতির প্রতি সুতীব্র ঘৃণা জনমানসে সাধারণভাবে রাজনীতির প্রতি অনীহা সৃষ্টি করেছে। আবার একথাও সত্য যে, এই ২৭ বছরে সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের প্রতিটি জনবিরোধী নীতির মোকাবিলায় আমাদের দলের কর্মীদের লাগাতার সংগ্রাম, রক্তপাত ও আত্মাহুতি জনগণের চোখে আমাদের দলকে গণআন্দোলনের একমাত্র শক্তি হিসাবে তুলে ধরেছে। ফলে, দলের প্রতি আজ জনসাধারণের সমর্থন, আস্থা ও সম্ভ্রম বহুগুণে বেড়েছে। এমনকি সি পি এম, সি পি আই-এর মতো দলগুলো থেকেও সৎ ও যথার্থ বাম-মনোভাবাপন্ন অনেক কর্মী আমাদের দলে যোগ দিচ্ছেন এবং যাঁরা এখনও খোলাখুলি আসতে পারছেন না তাঁরাও সমর্থন করছেন, আন্দোলনগুলিতে সহযোগিতা করছেন। সংক্ষেপে, আমাদের বিরুদ্ধে মেকী বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী

দলগুলোর জোটবদ্ধ বিরোধিতা, আমাদের ওপরে পুলিশি মদতে সি পি এম-এর সন্ত্রাস, আমাদের কর্মীদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা এবং এই সবকিছু সম্পর্কে বুর্জোয়া গণমাধ্যমগুলোতে প্রায় সম্পূর্ণ নীরবতা সত্ত্বেও বর্তমান সময়টা, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে, দলের অগ্রগতির পক্ষে তথা গণআন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। একথার মানে এই নয় যে, আমাদের সামনে কিংবা আন্দোলনগুলোকে বাস্তবে রূপ দেবার ক্ষেত্রে কোন বাধাবিঘ্ন, সংগঠনের নানা সমস্যা বা দুর্বলতা নেই। এগুলো সবই আছে। কিন্তু দলের সর্বস্তরে সমস্ত নেতা ও কর্মী ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় এইসব সমস্যা ও দুর্বলতাগুলোকে এক ধাক্কায় দূর করে দিতে পারলে এই সময়টা আমাদের পক্ষে নিঃসন্দেহে অনুকূল।

বহু আগে ১৯৭৪ সালে দলের কর্মীদের এক সভায় কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, ''পাবলিক আমাদের কথা শুনতে চাইছে, আমাদের সম্পর্কে একটা দরদী মনোভাব নিয়ে চলছে। আর শুধু পাবলিকই নয়, এত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও বিভিন্ন দলের সাধারণ কর্মীদের মধ্যেও এস ইউ সি আই-এর বক্তব্যের নানা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব দেখা যাচ্ছে। নানা লক্ষ্মণ থেকে এগুলি দেখা যাচ্ছে।

তাহলে এরকম একটা সময়ে আমাদের দলের কর্মীদের আরও সংহত করা দরকার। প্রতিটি কর্মীর ব্যক্তিগত উদ্যোগ, রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধি, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ করার শক্তিবৃদ্ধি, সামগ্রিকভাবে যৌথভাবে কাজ করার স্টাইল ও ক্রিয়াপদ্ধতি — এসব উন্নত করতে হবে, সময়োপযোগী করতে হবে। ... কিন্তু এটা করব শুধু মনে ভাবলেই চলবেনা, এই করব কথাটার অর্থ হচ্ছে, সমস্ত স্তরে করবার জন্য একটা আয়োজন, উদ্যোগ এবং প্রস্তুতির আন্দোলনের বন্যা বয়ে যাওয়া দরকার।''

সেই '৭৪ সালের তুলনায় আমাদের দলের প্রতি আজকের জনসমর্থন অনেক ব্যাপক ও বিপুল হলেও অন্যান্য দিকগুলো গুণগতভাবে প্রায় একই জায়গায় থেকে গেছে। আজকের এই ব্যাপক জনসমর্থন সত্ত্বেও পশ্চিমবাংলার গণআন্দোলনগুলোকে নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গায় আমরা এখনও পৌঁছাইনি। তবে অতি সুদূর হলেও তার একটা সম্ভাবনা আজ যেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই সম্ভাবনা বাস্তবে শেষপর্যন্ত কী রূপ নেবে তা বহু কিছুর উপর নির্ভর করে। শুধু বিপ্লবী দলের ভূমিকার উপরেই তা নির্ভর করেনা। কিন্তু একটা বিপ্লবী দল পরিস্থিতি অনুযায়ী তার নিজের ভূমিকাকে পালন করার জন্য, এমনকি বাস্তবে সম্ভব হলে পরিস্থিতিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকে, সংগঠনকে প্রস্তুত রাখে এবং নেতা ও কর্মীদের সচেতনতা ও কর্মদক্ষতাকে উন্নত করে। কমরেড শিবদাস ঘোষ দলের সর্বস্তরে এই আয়োজন, উদ্যোগ ও প্রস্তুতির সংগ্রামের কথাই বলেছিলেন। আশা করি, দলের সমস্ত কর্মীরাই এটা বোঝেন যে, বর্তমান অনুকূল পরিস্থিতিতে পার্টিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে দলের সর্বস্তরে এই উদ্যোগ গ্রহণের দরকার।

একাজ করতে হলে বর্তমান পরিস্থিতির রাজনৈতিক তাৎপর্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও শক্তিগুলোর কার্যকলাপ ও তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের চরিত্র, আমাদের সমর্থক ও জনসাধারণের মানসিকতা ও চেতনার স্তর, কর্মীদের রাজনৈতিক চেতনা, ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও কর্মক্ষমতার অবস্থা, বডিগুলোর কর্মপদ্ধতি — এই সব-কিছুকে খেয়ালে রেখে আমাদের সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ নিয়ে এগুতে হবে। কাজেই, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে দলের নেতারা থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মীদের একই দৃষ্টিভঙ্গি, ভাবনাধারণা এবং উপলব্ধি থাকা দরকার। মেকি বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী দলগুলোর মধ্যে গদির লড়াই ছাড়া আর কোন লড়াই আজ যে নেই, তা মানুষ নিজেরাই অভিজ্ঞতা থেকে বুঝে নিয়েছেন। তাছাড়া, নিজেদের মধ্যে যাই নকল লড়াই এই দলগুলি করুক, আমাদের বিরুদ্ধে যে এরা সবাই একজোট তাও গত কয়েক বছরে আমাদের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনগুলোর অভিজ্ঞতা নগ্নভাবে দেখিয়ে দিয়েছে। ফলে পার্লামেন্টারি রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে আমরা একা। কিন্তু একা আমরাই শোষিত জনসাধারণের পাশে। তাই, আমাদের প্রতি সাধারণ মানুষের এই সমর্থন।

এখন, বিপ্লবী রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে, এই বিপুল জনসমর্থনের মধ্যে কতকগুলো দুর্বলতার দিকও রয়ে গিয়েছে। আবার পার্টি নেতৃত্বেরও আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে কতকগুলো দুর্বলতা এবং ঝোঁক থেকে গেছে। এগুলো সমস্ত নেতা ও কর্মীদের

পরিষ্কার বোঝা দরকার। যেমন ধরুন, এই সমর্থন গড়ে উঠেছে একনাগাড়ে গত ২৭ বছর ধরে আমাদের দলের নেতৃত্বে বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে সই সংগ্রহ, ধর্ণা, ডেপুটেশন, মিটিং, মিছিল, মহামিছিল, আইনঅমান্য, রাইটার্স অবরোধ, পথ অবরোধ প্রভৃতি নানান ধরণের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে। অনেকবার বাংলা বন্‌ধ পর্যন্ত হয়েছে। আবার এর মধ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মূল্যবৃদ্ধি, বাসভাড়া বৃদ্ধি বা বিদ্যুৎ আন্দোলনের ওপর বারবার পুলিশ ও সি পি এম গুণ্ডাবাহিনীর নৃশংস আক্রমণ হয়েছে। মহিলা কর্মীদের ওপর চূড়ান্ত অশালীন আচরণ হয়েছে, প্রতিরোধ আন্দোলনও হয়েছে। কিন্তু, জনগণের নিজস্ব ইস্যুকে কেন্দ্র করে হলেও এই আন্দোলনগুলো গড়ে উঠেছিল শুধুমাত্র পার্টিকর্মী এবং সমর্থকদের একটা অংশের শক্তি সমাবেশের ভিত্তিতে। বৃহত্তর জনসাধারণকে আমরা এই আন্দোলনগুলোতে সামিল করতে পারিনি। তাঁরা সমস্ত ক্ষেত্রেই পরোক্ষে এই আন্দোলনগুলোকে আন্তরিক সমর্থন ও সাহায্য দিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু আমরা তাদেরকে অংশগ্রহণ করাতে সক্ষম হইনি। এমনকি বহু ক্ষেত্রে দলের কর্মীদেরও সকলকে জড়ো করা যায়নি। সেটা আমাদেরই কর্মপদ্ধতির ত্রুটির জন্য। আন্দোলনের একটা বড় দুর্বলতা ছিল এই জায়গায়। পরিকল্পিতভাবে এই দুর্বলতাকে কাটাতে না পারলে আগামী দিনে আন্দোলন ব্যাপক চেহারা নেবেনা, প্রয়োজনমত আন্দোলনকে দীর্ঘস্থায়ী করা যাবেনা, কর্মীরাও নানান চাপ থেকে মুক্ত হবেন না। শুরুতে অবস্থাও অন্যরকম ছিল। আমরা পারব কি পারবনা, আন্দোলন করার মত শক্তি আমাদের আছে কি নেই, এ নিয়ে মানুষের সংশয় ছিল। মানুষের মধ্যে সি পি এম-এর আক্রমণের ভয়ও ছিল। ফলে মানুষ সই দিয়েছেন, চাঁদা দিয়েছেন, আন্দোলনের সাফল্য চেয়েছেন — কিন্তু আন্দোলনে জড়াতে চাননি। আবার নেতৃত্বও এই অবস্থায় বৃহত্তর জনতাকে আন্দোলনে সামিল করার উপযুক্ত কর্মপদ্ধতিকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারেননি। ফলে তাঁরা কর্মীদের শুধু সক্রিয় অংশটিকে দিয়েই একটার পর একটা আন্দোলনের প্রোগ্রাম সংগঠিত করেছেন। একদিকে সি পি এম-এর গণআন্দোলনবিরোধী ও জনবিরোধী চরিত্র একেবারে নগ্ন হয়ে পড়া, জনমানসে সি পি এম-বিরোধী তীব্র ঘৃণার সৃষ্টি হওয়া ও জনসাধারণ থেকে সি পি এম-এর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া, অন্যদিকে এই আন্দোলনগুলোর ব্যাপকতা ক্রমশ বাড়তে থাকা, কিছু কিছু ক্ষেত্রে দাবি আদায় হওয়া, প্রতিটি ইস্যুতে দলের সময়োপযোগী ভূমিকা নেওয়া এবং আন্দোলনগুলো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দলের কর্মীদের নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমাদের উপর মানুষের একটা বিরাট আস্থা এবং বিশ্বাস গড়ে ওঠে। এই আস্থাটা আজ এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে দলের নানান প্রোগ্রামে জনসাধারণ শুধু যে সমর্থন যোগাচ্ছেন তাই নয়, বিক্ষিপ্তভাবে হলেও নানান জায়গায় নিজেরাই এগিয়ে এসে সহযোগিতাও করছেন। অর্থাৎ সমর্থনের প্রকৃতিটা পাল্টাচ্ছে। এই হল বর্তমান পরিস্থিতির একটা সংক্ষিপ্ত রূপ।

অথচ, এই পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে কর্মীদের রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধি ঘটাতে এবং তাদের কর্মক্ষমতাকে উন্নত করতে আমরা পারছি কোথায়? জনগণের আপন উদ্যোগে সহযোগিতার এই যে নানান বিক্ষিপ্ত ঘটনা, যার বহু রিপোর্ট আমরা পাচ্ছি, সেগুলোকে পরিকল্পিতভাবে রূপ দিয়ে ব্যাপক জনতাকে সংগঠিত করার কাজটি আমাদের কর্মীরা করতে পারছেন না। অথচ আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, আগামী দিনে শুধুমাত্র কর্মীদের দিয়ে নয়, তাদের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ জনতার সচেতন ও সক্রিয় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে গণআন্দোলন গড়ে তোলা। তাহলে, এই অনুকূল পরিস্থিতিতেও আমরা সেটা শুরু করতে পারছি না কেন? এ কথাটা কর্মীরা গভীরভাবে ভেবে দেখবেন। আমার একথার মানে এই নয় যে, কর্মীরা এ ব্যাপারে একেবারেই চেষ্টা করছেন না। কিন্তু আমরা আশানুরূপ সাফল্য পাচ্ছিনা। আমি জানি, এই না পারার জন্য বহু কর্মীরই মনে একটা বেদনা এবং অক্ষমতাবোধ আছে। এমনকি বহু সময় তাঁরা এ কারণে হতাশাগ্রস্তও বোধ করেন। আসলে সততা এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সঠিক কর্মপদ্ধতি অনুসরণ না করা এবং উপযুক্ত রাজনৈতিক চেতনার মান ও কর্মদক্ষতা আয়ত্ত করতে না পারার জন্যই এটা ঘটছে। কিন্তু তার দায়টা শুধু কর্মীদের একার নয়। তাদের মনে রাখা দরকার, শুধুমাত্র একনিষ্ঠা, সততা ও আন্তরিকতা থাকলেই এই ক্ষমতা আয়ত্ত করা যায় না। দলের রাজনীতির উপলব্ধির সত্যিকারের উন্নত মান অর্জন করা মানে হল, যে কোন প্রশ্নে দলের রাজনীতিকে

সঠিকভাবে উপস্থাপনার ক্ষমতা আয়ত্ত করা। যে কোনও বিরুদ্ধ প্রশ্ন যেদিক থেকেই আসুক না কেন, দলের মূল রাজনীতির আধারে তাকে মোকাবিলা করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে পারা। কিন্তু এই ক্ষমতা কি চাইলেই আয়ত্ত করা যায়? অন্য সব কিছুর মতো এটাও শিখতে হয়। একদিকে দলের রাজনীতি নিয়ে নিজেদের মধ্যে নিরন্তর চর্চা, অন্যদিকে এই বিপ্লবী রাজনীতির ভিত্তিতে নিয়মিত জনসংযোগ — এই দুটি কাজ সৃজনশীল প্রক্রিয়ায় প্রতিনিয়ত একসঙ্গে চালানোর মধ্য দিয়েই কর্মীদের এই ক্ষমতা আয়ত্ত করতে হয়। এর সাথে যে কথাটা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে মনে রাখা প্রয়োজন, তা হচ্ছে, উন্নত সংস্কৃতিগত মান অর্জনের সংগ্রাম ছাড়া বিপ্লবী রাজনীতির উন্নত উপলব্ধিও সম্ভব নয়। ফলে দলের রাজনীতির চর্চা, আন্দোলনগুলো সংগঠিত করা, জনসংযোগ ঘটানো প্রভৃতি কাজগুলি করার সাথে সাথে শ্রেণী, দল ও বিপ্লবের সাথে নিজেদের একাত্ম করে গড়ে তোলার উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের যে সংগ্রাম তা নিরলভাবে চালিয়ে যেতে হবে। এই কাজগুলি যদি তাঁরা সচেতন প্রয়াসে নিষ্ঠার সঙ্গে করতে পারেন, তাহলে এই ক্ষমতা তাঁরা দ্রুত আয়ত্ত করতে পারেন। তাহলে তাঁরা জনগণের একজন হয়ে জনগণের সঙ্গে মিশতে মিশতেই জনগণের হৃদয় জয় করতে পারবেন, অর্থাৎ ধীরে হলেও জনগণকে আন্দোলনের সক্রিয় সহযোগীতে পরিণত করতে পারবেন এবং তাদের সংস্পর্শে এসে জনগণের রাজনৈতিক চেতনা ও রুচি-সংস্কৃতির মানও উন্নত হতে থাকবে। কিন্তু নিয়মিত চর্চা ছাড়া এই ক্ষমতা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। তাছাড়া সেটা কর্মীরা একা একা করতে পারেন না। পার্টির মধ্যে একটা সুপরিকল্পিত কর্মপদ্ধতির মধ্য দিয়ে কর্মীদের সেইভাবে গড়ে তুলতে হয়। এই কর্মপদ্ধতির গোড়ার কথা হচ্ছে আদর্শগত সংগ্রামকে পার্টির মধ্যে জীবন্ত রাখা। এই পদ্ধতি অনুসারে কর্মীদের গড়ে তোলাটাই হচ্ছে নেতাদের আসল কাজ। নেতারা একটা দীর্ঘ সময় ধরে কর্মীদের মূলত আন্দোলনের নানা কর্মসূচিতে নিয়োজিত করে রেখেছেন। কিন্তু পাশাপাশি এই পদ্ধতিটা যত্নের সঙ্গে অনুসরণ করেননি। আন্দোলনে একটার পর একটা প্রোগ্রাম স্বাভাবিকভাবেই আসবে। কিন্তু সেগুলোকে পার্টির পক্ষে অপরিহার্য যে আদর্শগত সংগ্রাম তার সঙ্গে সংযোজিত করেই পরিচালনা করতে হবে — তাকে কোনমতেই অবহেলা করে নয়। যদিও এ সবই করা হয়েছে বৃহত্তর গণআন্দোলনের দিকে তাকিয়েই, কিন্তু পাশাপাশি দলের মধ্যে এই আদর্শগত সংগ্রামকে যতটা প্রয়োজন ততটা তীব্র করা হয়নি। এর পরিণতিতে সাধারণ কর্মীদের চেতনার মান এবং রাজনৈতিক কর্মদক্ষতার প্রয়োজনীয় বিকাশ হয়নি। তারা শুধু নির্দেশমাফিক কাজ করে গেছেন। কিন্তু কাজ করার এমন পদ্ধতিতে এই বিশেষ ক্ষমতাগুলো গড়ে ওঠেনা। আমি আগেই বলেছি যে, সুপরিকল্পিত পদ্ধতি অনুসারে, অশেষ ধৈর্য সহকারে নেতাদের এই ক্ষমতাগুলোকে সযত্নে কর্মীদের মধ্যে বিকশিত করিয়ে দিতে হয়। তা নাহলে আশু লাভের জন্য শেষপর্যন্ত অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। আজ এত অনুকূল জনসমর্থন সত্ত্বেও তাকে সচেতন ও সুসংহত করার মতো দক্ষ কর্মীর এই অভাব তারই নিদর্শন। এই দুর্বলতা থেকে আমাদের আন্দোলন পরিচালনা করার পদ্ধতিকে অবিলম্বে মুক্ত করতে হবে।

নেতারা যদি একই সঙ্গে সব দিক খেয়ালে রেখে একটা সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি নিয়ে না চলেন, তাঁরা যদি পার্টির বাইরে আন্দোলনের পাশাপাশি পার্টির অভ্যন্তরে আদর্শগত সংগ্রামকেও একই সঙ্গে চালাতে না পারেন, একপেশে কোন চিন্তা বা ঝোঁকের দ্বারা প্রভাবিত হন, তাহলে আন্দোলনের জন্য তাঁদের আকুলতা এবং নিষ্ঠা সত্ত্বেও এর ফলে আন্দোলন এবং পার্টিই শেষপর্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়বে। অথচ দলে আদর্শগত চেতনার সাধারণ মানটা আজ এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, সাধারণ কর্মীরা এই দুর্বলতাগুলো ধরতে পর্যন্ত পারছেন না। যেমন ধরুন, কর্মীদের আদর্শগত চেতনার মান, পার্টির ও বিপ্লবের সঙ্গে নেতা ও কর্মীদের একাত্মতার সংগ্রাম, দলের বর্তমান আভ্যন্তরীণ পরিবেশ, বিভিন্ন স্তরে বডিগুলোর ফাংশানিং-এর রীতি, এগুলোর যে কোনটাকে বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে এই সমস্ত ক্ষেত্রগুলোতে বর্তমানে অনেক রকমের দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে আমি এই দুর্বলতার একটা উদাহরণ দিচ্ছি, যাতে সকলেই বিষয়টা ধরতে পারেন। কর্মীদের আদর্শগত চেতনার মানকে নিরন্তর বিকশিত করার জন্য কমরেড শিবদাস ঘোষ সমস্ত নেতা ও কর্মীকে জড়িত করে পার্টির সর্বস্তরে নিরবচ্ছিন্ন ও তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার উপর সারা জীবন জোর দিয়ে গেছেন। কারণ,

কর্মীদের উন্নত চেতনাই সমস্ত রকম বিচ্যুতির হাত থেকে পার্টিকে রক্ষার একমাত্র গ্যারান্টি। আবার এই উন্নত চেতনা আয়ত্ত করার অন্যতম শর্ত হল উন্নত সর্বহারা সংস্কৃতি আয়ত্ত করা — এবং এই দুটো মিলেই বিপ্লবী কর্মক্ষমতাও উন্নত হয়। তাহলে, কর্মীদের চেতনা, চরিত্র ও সংস্কৃতির মানকে ক্রমাগত উন্নত করার জন্য দলের ভেতরে এই আদর্শগত ও সংস্কৃতিগত সংগ্রামের গুরুত্ব অপরিহার্য। সেইজন্যই কমরেড শিবদাস ঘোষ দলের শুরুর দিনটি থেকেই সমস্ত নেতা ও কর্মীকে জড়িত করে এই সংগ্রামটি অক্লান্তভাবে করে গেছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবনাবসানের পর দলের মধ্যে এই আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার, অর্থাৎ দলের আদর্শগত চেতনার সাধারণ মানটিকে ক্রমাগত উন্নত করার সংগ্রামটিকে দলের সমস্ত নেতা ও কর্মী মিলে আরও তীব্রভাবে পরিচালনা করা একটা গুরুতর প্রয়োজন রূপে উপস্থিত হয়েছে। বিশেষ করে আজকের পরিস্থিতিতে, আমাদের পেছনে জনসমর্থনকে দলের বিপ্লবী রাজনীতি অনুযায়ী সচেতন ও সংগঠিত করা যখন আশু প্রয়োজন, তখন কর্মীদের রাজনৈতিক চেতনা ও সংগঠন ক্ষমতাকে সময়োপযোগীভাবে উন্নতকরার প্রয়োজন যে কত অপরিহার্য তা আজ সকলেই উপলব্ধি করছেন। অতএব দলের মধ্যে আদর্শগত সংগ্রামকে তীব্রতর করার দ্বারাই সমস্ত নেতা ও কর্মীর আদর্শগত চেতনার সাধারণ মান এবং কর্মদক্ষতাকে আমাদের উন্নত করতে হবে। এই সংগ্রামটা এমন নয় যে কর্মীরা নেতাদের কাছ থেকে রাজনৈতিক, সাংগঠনিক, ব্যক্তিগত বা আন্দোলনসংক্রান্ত নানা বিষয়ে শুধু শুনে যাবেন। তাঁরা শুনবেন, পরিষ্কার বুঝে নেবেন, না হলে প্রশ্ন করবেন, নিজেরা না বোঝা পর্যন্ত নেতাদের ছাড়বেন না, ফয়সালা করবেন। অর্থাৎ তাঁদের বোঝাটা যেন দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে হয়, যান্ত্রিকভাবে নয়। তবে একথাও ঠিক, জনসংযোগ এবং আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ছাড়া তাঁরা সঠিক উপলব্ধি অর্জন করতে পারবেন না। তাই একদিকে দলের অভ্যন্তরে নিরন্তর আদর্শগত চর্চা ও উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের সংগ্রাম, অন্যদিকে দৈনন্দিন রাজনৈতিক কাজকর্মের মাধ্যমে নিয়মিত জনসংযোগ করে যেতে হবে। আর, এইভাবে জনতার একজন হয়ে তাদের মধ্যে পার্টির বিপ্লবী রাজনীতিকে নিয়ে যেতে হলেই কর্মীরা হাজার একটা যে দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি, প্রশ্ন ইত্যাদির সম্মুখীন হবেন, সেগুলোর সুষ্ঠু সমাধান করে দলের রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের আপন বুদ্ধিতে, স্বকীয় উদ্যোগে আদর্শগত সংগ্রাম করতেই হবে। এই প্রক্রিয়াতেই তাদের নিজেদের চেতনা ও কর্মক্ষমতাও উন্নত হবে। প্রত্যেক কর্মীর এই অভিজ্ঞতার যৌথ বিনিময় আবার দলের সামগ্রিক আদর্শগত চেতনার মান এবং যৌথ জ্ঞানকেও আরো বিকশিত করবে। সেটা প্রতিটি কর্মীর বিকাশেই সাহায্য করবে। এইভাবে দলের প্রতিটি কর্মীর উদ্যোগ এবং কর্মক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেবার দ্বারা দলের আভ্যন্তরীণ আদর্শগত সংগ্রাম দলের সমস্ত কর্মসূচিকেই সফলতার দিকে নিয়ে যাবে। এখানে বিশেষ করে জনগণের মধ্যে দলের আদর্শগত প্রচারের বিষয় নিয়ে কিছু বলার আছে। কমরেড ঘোষের জীবদ্দশায় তিনি দলের এই প্রচার অভিযান চলাকালীন নিজে প্রতিদিন খোঁজ নিতেন প্রচার কেমন চলছে এবং এ সম্পর্কে জনসাধারণের উৎসাহ কেমন, তারা কি বলে, কোন্ বইয়ের বিক্রি বেশি হয় ইত্যাদি। জনগণের মধ্যে এই আদর্শগত প্রচার অভিযানও পার্টির আদর্শগত সংগ্রামের অঙ্গ।

তিনি পার্টির পত্রপত্রিকা, বই কর্মীদের সর্বদাই সঙ্গে নিয়ে চলতে বলতেন, যাতে প্রয়োজনমত যে সমস্ত মানুষের সাথে তাদের সংযোগ হচ্ছে তাদের কাছে তাঁরা তা দিতে পারেন। প্রচারাভিযানের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকটিও নেতারা কখনও কখনও হয়তো তাঁদের বক্তব্যে উল্লেখ করেন, কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে তাঁরা প্রতিনিয়ত খোঁজ করেন না। ফলে এই দিকটিও ভালভাবে হচ্ছে না। এর ফলে দেখা যাচ্ছে, এমনকী কমরেড শিবদাস ঘোষের বইয়েরও নিয়মিত অধ্যয়ন ও বিক্রি যথেষ্ট কমে গেছে। অথচ, জনগণের মধ্যে এই আদর্শগত প্রচার অভিযানও পার্টির আদর্শগত সংগ্রামের অঙ্গ।

আদর্শগত চর্চার এই ঐতিহ্যটি যে বর্তমানে অত্যন্ত ক্ষীণ তা আজকালকার কর্মীদের হয়তো চোখে পড়েনা, কিন্তু পুরনো কর্মীদের চোখে পড়ে। প্রোগ্রামভিত্তিক কর্মপদ্ধতিকে অনুসরণ করার সময় তার পাশাপাশি আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার মৌলিক দলীয় প্রক্রিয়াটিকেও তীব্রতর করার দিকটি অবহেলিত হয়ে পড়েছিল। আর, এরই পরিণতিতে গোটা দলে কর্মীদের চেতনার মান আগের তুলনায় নিচে নেমেছে। আমাদের কর্মীরা সৎ, একনিষ্ঠ, পরিশ্রমী কিন্তু

তাদের অধিকাংশের দলের রাজনীতির উপলব্ধিটা হল ভাসা ভাসা। তার কারণ, আদর্শগত-রাজনীতিগতভাবে তাদের তৈরি করার উপযুক্ত প্রক্রিয়ার অভাব। কাজ শেষ হলে যখন পরস্পরের সঙ্গে দেখা হয় তখন রাজনীতি তাদের চর্চার বিষয়বস্তু হয় না। তারা শুধু নেতাদের কাছ থেকে শুনে যান। অর্থাৎ প্রশ্ন তোলার, একটা জটিল বিষয়ের উত্তর খোঁজার, দশটা রাজনৈতিক প্রশ্নের সমাধান নিয়ে মাথা ঘামানোর মধ্যে তাঁরা নেই — অথচ তাঁরা দিনরাত খেটে যাচ্ছেন! তাই, সি পি এম-এর ধুরন্ধর কর্মীদের সঙ্গে তর্কাতর্কির সময় আমাদের অনেক কর্মীই বহু সময় ওদের কূট যুক্তিকে ঠেকাতে এবং আসল কথাকে ঘুরিয়ে দিয়ে আমাদেরকে প্যাঁচে ফেলার কায়দাকে আটকাতে পারেননা এবং দলের সঠিক রাজনীতি এবং যুক্তির জোরে ওদেরকে কোণঠাসা করে দিতে পারেননা। অথচ দলের রাজনৈতিক বক্তব্যের উপলব্ধি বা আদর্শগত চেতনার উপযুক্ত মান থাকা মানে হল যে কোন প্রতিকূল পরিবেশ বা রাজনৈতিক বিরুদ্ধতার মধ্যেও দলের রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠা করতে পারার ক্ষমতা। বর্তমান পরিস্থিতিতে কমরেডদের এমন উন্নত চেতনার মান আয়ত্ত করতে হবে। তার জন্য আন্দোলনগুলো গড়ে তোলা ও পরিচালনার সাথে সাথে আদর্শগত সংগ্রামের সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ নিতে হবে।

আন্দোলন অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু এই আদর্শগত সংগ্রামকে একইসঙ্গে পরিচালনা না করে শুধুমাত্র আন্দোলনের কিছু কর্মসূচি পালন স্তরে স্তরে বডি ফাংশানিংকেও দুর্বল করেছে। পার্টি বডিগুলোর কাজ কি ? তাঁরা অবশ্যই পার্টি ও গণসংগঠনগুলোকে শক্তিশালী করার এবং গণআন্দোলনগুলোকে গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন, কিন্তু তাদের প্রাথমিক কাজ হল একেবারে সেল থেকে শুরু করে সমস্ত স্তরে কর্মীদের চরিত্র, চেতনা ও পার্টি সংস্কৃতির মান এবং স্বকীয় উদ্যোগ ও কর্মক্ষমতাকে সুপরিকল্পিতভাবে বিকশিত হতে সাহায্য করা। এই প্রথম কাজটাই হল তাদের অন্য কাজগুলোর ভিত্তি। কিন্তু আদর্শগত সংগ্রামকে একই সঙ্গে পরিচালনা না করে কর্মীদের দিয়ে পর পর শুধু প্রোগ্রাম করাতে গিয়ে তাদের এই সমস্ত গুণ এবং ক্ষমতাগুলোকে বিকশিত করার কাজটি কার্যত অবহেলিত হয়েছে, তেমনই সর্বস্তরে বডিগুলোও দুর্বল হয়েছে। আন্দোলন পরিচালনার এই প্রক্রিয়ার ফলে দলের আভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক কর্মপ্রক্রিয়া এবং সাংগঠনিক কাঠামোগুলো দুর্বল হয়েছে। অথচ এই গুরুতর বিষয় সম্পর্কে দলের কোন স্তরের নেতৃত্বকারী কোন সংগঠক বা নেতা পার্টি নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বলে আমি জানিনা। একথা ঠিক যে, এইভাবে কাজ করতে গিয়ে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে তাঁরা কি কি অসুবিধার মুখোমুখি হচ্ছেন, বা স্থানীয় সংগঠনে কি কি অসুবিধা দেখা দিচ্ছে, একথা তাঁরা বহুবার নেতৃত্বকে বলেছেন। কিন্তু আন্দোলন পরিচালনার এই রীতি ও পদ্ধতি ভেতর থেকে গোটা পার্টিকেই যে দুর্বল করে দিচ্ছে, এইটা তাঁরা নেতৃত্বকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাননি। এটা একটা নিদর্শন যে, দলের নেতৃস্থানীয় সংগঠক ও নেতারাও যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন।

এখন, এই আলোচনা থেকে কেউ যেন মনে না করেন যে, কর্মীদের চেতনা, রাজনৈতিক কর্মক্ষমতা, স্বকীয় উদ্যোগ কিংবা বডি ফাংশানিং এইসব প্রশ্নে আগে আমাদের মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতাই ছিল না। কিন্তু তার বিরুদ্ধে সবসময় একটা সচেতন ও সর্বাত্মক দলীয় সংগ্রামও ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক প্রোগ্রামভিত্তিক কর্মপদ্ধতির ওপর একপেশে জোর দিতে গিয়ে আভ্যন্তরীণ দলীয় সংগ্রামটা অবহেলিত হয়েছে। এই জায়গাটায় নেতারা কাজের চাপে ততটা গুরুত্ব দেননি বা সবসময় খেয়ালে রাখেননি। এটা একটা বিপ্লবী দলের আভ্যন্তরীণ যৌথ জীবনযাত্রা পদ্ধতির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এর ফলেই কর্মীদের চেতনার মানের অবনতি, বডি ফাংশানিং-এর ক্ষেত্রে এবং অন্য আরো বহু ক্ষেত্রে দুর্বলতাগুলো এই আকারে দেখা দিয়েছে। তাই, এই দুর্বলতাগুলোকে এক ধাক্কায় দূর করে সর্বস্তরে আপনারা নেতা ও কর্মীরা সময়োপযোগী উন্নত রাজনৈতিক চেতনা ও কর্মক্ষমতা আয়ত্ত করা এবং যৌথ কর্মপ্রক্রিয়া ও বডি ফাংশানিংকে উন্নত করার জন্য যদি একটা সর্বাত্মক উদ্যোগ নিতে না পারেন, তাহলে এই অনুকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও পার্টিকে আপনারা আরো শক্তিশালী করতে পারবেন না এবং আন্দোলনকেও আরো উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে পারবেন না। আমাদের দলের কাছে এই হল বর্তমান পরিস্থিতির তাৎপর্য। ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে আপনারা এই কর্তব্য পালন করতে এগিয়ে আসবেন কিনা, তারই উপর নির্ভর করছে অদূর ভবিষ্যতে গণঅসন্তোষ

আবার যখন ফেটে পড়বে, তা নিছক স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভেই শেষ হবে — যা নাকি বরাবর হয়ে এসেছে — নাকি সেগুলোর উপর সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্ব, অর্থাৎ আমাদের দলের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা দেবে। তাই আজকের গণসমর্থন দেখে শুধুমাত্র উল্লসিত ও আত্মসন্তুষ্ট হলে বিপ্লবের অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছুতে পারব না। বরং তাকে আরো সংহত করার জন্য পার্টিগতভাবে দ্রুত সবরকম ক্ষমতা অর্জন করার চিন্তাই আমাদের পীড়িত করা উচিত। কারণ, আমরা যথাসম্ভব দ্রুত পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করতে না পারলে নিঃসন্দেহে সে সুযোগটা নেবে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক সি পি এম এবং দক্ষিণপন্থীরা।

যেমন ধরুন, আমাদের পেছনে যে জনসমর্থন কাজ করছে, সেটা অন্যান্য পার্লামেন্টারি দলগুলোর সুবিধাবাদী রাজনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত এবং আমাদের দলের রাজনীতির পরিষ্কার উপলব্ধির ওপর দাঁড়িয়ে আছে বলে যদি মনে করি, তাহলে কিন্তু আমরা ভুল করব। আসলে জনমনে সি পি এম-বিরোধী চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া, আমাদের দলের সংগ্রামী ভূমিকা এবং বিশেষ করে আমাদের নেতা ও কর্মীদের নিষ্ঠা, শালীনতা ও উন্নত সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণকে এই ব্যাপক সমর্থনের রূপ দিয়েছে। অর্থাৎ, আমি বলতে চাইছি যে, আমাদের প্রতি এই সমর্থন যেমন একটা বাস্তব ঘটনা, তেমনই আমাদের সমর্থক জনসাধারণের মধ্যে আমাদের রাজনীতির উপলব্ধিটা যে খুব স্পষ্ট নয় এটাও একটা বাস্তবতা। সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে, ঠিক একইভাবে পশ্চিমবাংলার যে ব্যাপক জনতা আজ সি পি এম-কে চরম ধিক্কার জানাচ্ছে তারা যে সবাই সি পি এম-এর শ্রেণীচরিত্র সম্পর্কে সচেতন হয়ে, বুঝেশুনে তাকে বর্জন করেছে, বা তার মোহ থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়ে গেছে তা নয়। শুনতে অবাক লাগলেও পার্লামেন্টারি রাজনীতির বিভ্রান্তি মানুষকে এভাবেই ঠকায়। যতদিন এই ইলেকশন রাজনীতি বজায় থাকবে, অর্থাৎ বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া মেকি মার্কসবাদী দলগুলোর প্রভাব খতম হয়ে জনসাধারণের ওপর বিপ্লবী দলের, অর্থাৎ আমাদের দলের, অবিসংবাদিত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততদিন ঘৃণা, বিক্ষোভ, বিরোধিতা যাই থাকুক, মানুষ এই বুর্জোয়া দলগুলোর চালাকিতে বার বার ভুলবে। এই পশ্চিমবাংলাতেই কি মানুষ একদিন কংগ্রেসকে গদি থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়নি ? কিন্তু তা বলে আবার কি তারা ফিরে আসেনি ? কাজেই, আজ সি পি এম-এর বিরুদ্ধে মানুষের জ্বলন্ত বিক্ষোভ দেখেই যেন এই মৌলিক বিচার এবং শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গিটা কমরেডদের ভুল না হয়।

আমাদের কর্মীদের বুঝতে হবে যে, জনগণের আজকের এই সি পি এম-বিরোধিতা হল অন্ধ বিরোধিতা। এর চরিত্র নেগেটিভ, অর্থাৎ এটা একটা বিকল্প পজিটিভ তথা বিপ্লবী রাজনীতির ভিত্তিতে বিরোধিতা নয়। তাই এটা দীর্ঘস্থায়ীও হয় না এবং পরিকল্পিত ও সুসংগঠিতও হয় না, যদি না পরিস্থিতি অনুকূল থাকতে থাকতে বিপ্লবী দল যত দূর সম্ভব ব্যাপক জনসংযোগের মাধ্যমে জনগণকে বিপ্লবী রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন এবং দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের মতো উপযুক্তভাবে সংগঠিত করে তোলে। অতএব, বৃহত্তর জনসাধারণের সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রেখে একদিকে জনগণকে রাজনৈতিক সচেতন করা, নানান উপায়ে সংগঠিত করা, অন্যদিকে দল এবং গণসংগঠনগুলোকে শক্তিশালী করার সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ নেওয়া ও সর্বোপরি সেল থেকে শুরু করে প্রতিটি স্তরে কর্মীদের সর্বতোমুখী বিকাশের জন্য বডিগুলোকে তাদের কর্মপদ্ধতি এবং কর্মক্ষমতাকে দ্রুত উন্নত করতে হবে। বিশেষ করে পার্টির মধ্যে ঢিলেঢালা ভাব, রাজনৈতিক চেতনার অনুন্নত মান, আদর্শগত চর্চায় শ্লথতা, বডি ফাংশনিং-এর ক্ষেত্রে এবং নেতা-কর্মী সম্পর্কের ক্ষেত্রে যান্ত্রিকতার প্রভাব এবং পরিণতিস্বরূপ দলের সর্বহারা সংস্কৃতি ও যৌথ জীবনযাপন রীতির জায়গায় প্রচলিত সমাজের নান ক্লেদ ও বুর্জোয়া ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাপদ্ধতির যে প্রভাব দেখা যাচ্ছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে বডিগুলোকে সংগ্রামের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ স্থির করতে হবে।

এই পদক্ষেপগুলো নেবার সময়, কমরেড শিবদাস ঘোষ যে সুনির্দিষ্ট মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করে আমাদের দলকে গড়ে তুলেছিলেন, সেগুলোকে সবসময় মনে রাখতে হবে। একটা সত্যিকারের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলের মূল ভিত্তি হল গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণ। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, এই গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। তার মধ্যে একটা হল আদর্শগত একেন্দ্রীকরণ, যেটা দুর্বল হয়ে পড়লেই দলের বিচ্যুতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই আদর্শগত

কেন্দ্রিকতাকে ভিত্তি করেই দলের সাংগঠনিক কেন্দ্রিকতা গড়ে ওঠে। তাই আদর্শগত কেন্দ্রিকতাকে রক্ষা না করা গেলে নেতৃত্বের মধ্যে আমলাতান্ত্রিকতা, কর্মীদের মধ্যে ঢিলেঢালা ভাব এবং গোটা দলের মধ্যে যান্ত্রিকতার প্রভাব দেখা দিতে বাধ্য। এই কারণেই দল গঠনের একেবারে শুরুর দিনগুলো থেকেই কর্মীদের চেতনাকে প্রোজ্জ্বল ও স্বচ্ছ করার জন্য কমরেড ঘোষ দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় থেকে শুরু করে বিজ্ঞান, দর্শন, মনস্তত্ব, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি, এমনকি ব্যক্তিগত আচার-আচরণের খুঁটিনাটি ও যৌনজীবন পর্যন্ত জীবনের সমস্ত দিককে ব্যাপ্ত করে তিনি নিজে আলোচনা করতেন এবং সমস্ত কর্মীদেরও এই মতামতের সংঘর্ষে লিপ্ত করে দিতেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে এইভাবে যে জ্ঞানভাণ্ডারের তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, তা-ই আমাদের দলের আদর্শগত কেন্দ্রিকতার ভিত্তি। এইভাবেই তিনি কর্মীদের প্রতিটি বিষয়ে মত বিনিময়, তর্কবিতর্ক, আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সত্যকে নিজেরাই খুঁজে বার করার, বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাকে বিকশিত করে দিতেন। ফলে কর্মীরা যেমন সারা দিন পার্টির কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন, আবার পরস্পর মিললেই তাঁদের মধ্যে হাজারটা বিষয়ে তর্কবিতর্ক, আলোচনা, গভীর বিচার-বিশ্লেষণও শুরু হয়ে যেত। আজকালকার সাধারণ কর্মীরা, যাঁরা এই ইতিহাস জানেন না, মনে রাখবেন যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে একদিকে নিয়মিত রাজনৈতিক কাজকর্ম, আর অন্যদিকে প্রতিনিয়ত এই সর্বাত্মক আদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়েই দলের যৌথ জ্ঞানের জন্ম। কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারারও জন্ম এই প্রক্রিয়াতেই। এই চর্চাকে আজ তীব্রতর করতে হবে এবং তার জন্য উপযুক্ত পার্টি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। কারণ, মনে রাখবেন, কাজের পাশাপাশি জ্ঞানচর্চাকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত করার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারলে, শুধু সার্কুলার দিয়ে এটা হবে না। চাই জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে কর্মীদের এই সংগ্রামে টেনে আনা। এবং সেই কাজটা নিঃসন্দেহে নেতারাই আগে কাঁধে তুলে নেবেন।

দলের মধ্যে আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার এই যে ঐতিহ্য কমরেড শিবদাস ঘোষ অক্লান্ত পরিশ্রমে তিল তিল করে গড়ে তুলেছিলেন, তাই এই দলের যৌথ জীবনযাত্রা পদ্ধতির বিশেষ রূপটিও গড়ে দিয়েছিল। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বিজ্ঞানের আলোয় তিনি ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া মানবতাবাদ, ব্যক্তিবাদ ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাপদ্ধতিকে সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত করা ও তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার দ্বারা স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালোবাসা, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধ প্রভৃতি মানবিক মূল্যবোধগুলিকেও সর্বহারা নৈতিকতার আধারে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই সংগ্রামের পথেই সমস্ত রকম অন্ধতা, গোঁড়ামি, ব্যক্তিবাদী প্রবণতা, গ্রুপিজম ও যান্ত্রিক চিন্তাপদ্ধতি থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের দলের আভ্যন্তরীণ যৌথ জীবন গড়ে উঠেছে। কিন্তু শুধু বিচ্ছিন্নভাবে তত্ত্ব আলোচনার মধ্য দিয়েই এটা হয়নি। এটা ছিল একটা যৌথ জীবনসংগ্রামের ফল, যার রূপটি বুঝিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, 'constant common activity, constant common association, constant common discussion'। অর্থাৎ, প্রতিনিয়ত একত্রে কাজ, প্রতিনিয়ত একসঙ্গে থাকা, প্রতিনিয়ত একত্রে আলোচনা। দলীয় এই যৌথ জীবনের সঙ্গে একাত্ম হবার মধ্য দিয়েই কর্মীরা দলের যৌথ সংস্কৃতিকে আয়ত্ত করে। এই দলীয় সংস্কৃতি আয়ত্ত করা ব্যতিরেকে দলের আদর্শ ও রাজনীতির উপলব্ধিও পরিণত হয় না। দলের মধ্যে এই যৌথ কর্মপ্রক্রিয়া ও যৌথ চিন্তাপ্রক্রিয়া ঠিক মতো চালু থাকলে এবং দলের সঙ্গে কর্মীদের নিবিড় সম্পর্ক বজায় থাকলেই নেতা ও কর্মীদের মধ্যে যান্ত্রিক সম্পর্কের বদলে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেটা দলের সংহতিকে আরও সুদৃঢ় করে। এই আলোচনার থেকে আপনারা নিজেরাই নিশ্চয়ই ধরতে পারছেন যে, অপেক্ষাকৃত অনেক ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে শুরু করেও যে মৌলিক আদর্শগত ও সাংগঠনিক পদ্ধতিগুলো কঠোরভাবে অনুসরণ করার দ্বারা কমরেড শিবদাস ঘোষ এস ইউ সি আই-কে একটা সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে গিয়েছিলেন — আজ দল অনেক বড় হলেও সেই পদ্ধতিগুলো অনুসরণের ক্ষেত্রে আমাদের ত্রুটি হচ্ছে।

সর্বশেষে আপনাদের বলব, আমাদের নিজেদের ত্রুটি নিয়ে আমার এই সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা আমি যাই করে থাকি, সেটা হা-হুতাশ করার জন্য নয়, সমস্ত রকমের ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত করে দলের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের

সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দলকে আরও মজবুত ও সংহত করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, যেটা আজ অবশ্যপ্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে নিজেদের দুর্বলতার বিরুদ্ধে নিজেদের সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে কমরেড ঘোষের একটি অত্যন্ত মূল্যবান শিক্ষা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে এই আলোচনা শেষ করতে চাই।

তিনি বলেছেন, ''এই সমাজের যে সমস্ত ক্লেদ আমরা ফেলে দিতে চাইছি, সেগুলো আমরা ফেলে দিতে চাইছি বলে সঙ্গে সঙ্গে সকলেই আমরা সেগুলো ফেলে দিতে পেরেছি, এমন ঘটেনা। অথবা, এই সমস্ত ক্লেদ যাঁরা ফেলেও দিতে পেরেছেন, তাঁদের মধ্যেও যে আবার এই সমাজের কাদামাটি জমছে না, বা প্রতিমুহূর্তে জমবার চেষ্টা করছে না, তা বলা যায় না। ফলে সেগুলো একটা মুহূর্তের জন্য হলেও আমাদের বিস্মৃত করে দিতে পারে, বা এই সমস্ত বাজে জিনিসের শিকার করে দিতে পারে। যার বিপ্লবের চেতনাটা অত্যন্ত পরিষ্কার, পরিস্ফূট এবং প্রাঞ্জল — যে জলের মতো সমস্ত জিনিস দেখতে পায়, এবং খবর পায় — যে সোজা কথাটা যেমন অত্যন্ত সহজভাবে বুঝতে পারে, তেমনি জটিল কথাটাও অত্যন্ত সহজভাবে ধরতে পারে। সত্যিকারের বিপ্লবী হলে তৎক্ষণাৎ বা অতি সত্বর এর অকার্যকরী দিকটা সে বুঝতে পারে।''

আশা করি, কমরেড শিবদাস ঘোষের এই অমূল্য শিক্ষা আপনাদের সঠিক পথে সংগ্রাম পরিচালনা করতে সাহায্য করবে।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06 R. No 5268 / 60

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী।

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা